Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা ফেরদাউস

রোলঃ 23090120139

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফারহানা ফেরদাউস

রোলঃ 23090120139

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফারহানা ফেরদাউস, আইডিঃ 23090120139 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফারহানা ফেরদাউস

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

ফারহানা ফেরদাউস

আইডিঃ 23090120139

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....5
ইলমের পরিচয়.....6
ইলমের উদ্দেশ্য.....8
ইলমের গুরুত্ব.....9
ইলমের ফজিলত.....11
ইলমের অন্বেষণের বিধান.....22
ইলম অর্জনের মূলনীতি.....24
ইলমের শ্রেণিবিভাগ.....26
ইলম এবং মা'লুমাত এর মধ্যে পার্থক্য.....28
ইলম অর্জনের আদব.....30
ইলমের উপকরণের আদব.....42
ইলম থেকে মাহরুমীর কারণ.....43
ইলম থেকে মাহরুমী সম্পর্কে কিছু ঘটনা.....53
দ্বীনি ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি.....57
অনলাইন থেকে সঠিক পন্থায় জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি.....63
তালিবুল ইলমের গুণাবলী.....65
ইখতিলাফি বা মতভেদপূর্ণ আলোচনায় তালিবুল ইলমের করণীয়.....74
ইলম ও আমল.....77
বয়স্কদের ইলম অর্জন.....86
ইলম সম্পর্কে কিছু নাসিয়াহ.....91
উপকারী ইলমের দুআ.....92
উপসংহার.....97
তথ্যসূত্র.....98

ভূমিকা

মানব সৃষ্টির সূচনা লগ্ন থেকেই "ইলম" হলো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। জাযিরাতুল আরবের ঘোর অন্ধকার যুগে যখন পাপাচার ও অজ্ঞতা চরম সীমায় পৌঁছে ছিলো, তখন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হেরা গুহাতে জিবরাঈল (আ:) এর মাধ্যমে মানবজাতির মুক্তির জন্য প্রথম যে বাণীটি প্রেরণ করেন তা ছিলো **"اِقْرَاْ-পড়ো"**। *আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,*

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِیۡ خَلَقَ.

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরাঃ ৯৬/ আল-আলাক, আয়াতঃ ০১)

ইসলাম কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মানবজাতিকে আলোর পথে নিয়ে আসার জন্য জ্ঞান অর্জনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। ক্ষণিকের এই জিন্দেগিতে আমাদের জীবন যাপন করার জন্য ইলম অর্জন করা অপরিহার্য। হোক তা দুনিয়াবি ইলম অথবা আখিরাতি ইলম। শরয়ী দৃষ্টিকোন থেকে আখেরাতের ইলম অর্জন করার ব্যাপারে অনেক ফজিলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে দুনিয়াবি ইলমের ব্যাপারে তেমন কোনো গুরুত্ব বা ফজিলতের কথা শরিয়ত উল্লেখ করেনি। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে ইলমের পরিধি অত্যন্ত বিশাল। এই ইলম হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য অনেক বড় এক নিয়ামত। এই নিয়ামতের যথাযথ কদর এবং মূল্যায়ন করার জন্য আমাদেরকে এই ইলমের আদব, সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা জরুরি। সঠিক ইলমের গুরুত্ব অনুধাবন করা, এর ফজিলত সম্পর্কে জানা এবং ইলমের সাথে সম্পর্কিত আদব, আমল, নসীয়াহ ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা, বোঝা এবং তা বাস্তব প্রয়োগ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সঠিক ইলম ছাড়া ইবাদত শুদ্ধভাবে সম্পন্ন হয় না। এই গবেষণাপত্রে আমরা ইলমের গুরুত্ব, ফজিলত এবং ইলমের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াবলী বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। আশা করা যায়, এই গবেষণাপত্রে পাঠকের মাঝে ইলমের গুরুত্ব ও ফজিলতের বিষয়ে গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি করবে এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তাদের বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার মাধ্যমে ইলম দ্বারা নিজেকে সমৃদ্ধ করা সহজতর করবে।

ইলমের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ: ইলম শব্দটি جَهْلٌ শব্দের বিপরীত। ইলমের অর্থ জ্ঞান, কোন জিনিসকে দৃঢ়তার সাথে সঠিক ভাবে জানা ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা: কয়েকজন বিদ্বান বলেছেন, ইলম হলো কোনো কিছুর প্রকৃত অবস্থা জানা। আর এটি অজানা ও অজ্ঞতার বিপরীত। অন্যান্য আলিম বলেছেন, ‘‘নিশ্চয় ইলম কোনো কিছুর প্রকৃত অবস্থা জানার চেয়েও অধিকতর সুস্পষ্ট’’। আর এখানে ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলমে শারঈ। আর ইলমে শারঈ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যেসব সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেছেন সেগুলোর "ইলম"। শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ) বলেন,

العلم : إدراك الشيئ على ما هو عليه إدراكا جازما

‘‘অর্থাৎ কোন জিনিসকে তার মূল স্বরূপের উপর দৃঢ়ভাবে জানা।’’ যেমন: এটা জানা যে, ‘আংশিক অপেক্ষা বৃহত্তর পূর্ণ’ ইবাদতের ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত প্রভৃতি।

ফরজ ইলম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ২২৪)

দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ- এ কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু দ্বীনের কী পরিমান ইলম কার জন্য কখন শেখা ফরজ এ সম্পর্কে অধিকাংশই উদাশীন। অথচ এটি সবার জানা জরুরি যে, ইসলামী জীবনব্যবস্থার যথার্থ বাস্তবায়ন এবং নিজ ঈমান-আমলের হেফাজত করার জন্য যে পরিমাণ ইলম শেখা প্রয়োজন, তার সবটুকুই ফরজ ইলমের আওতাধীন।

অতএব, ফরজ ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইলমে দ্বীনের ওই জরুরি অংশ, যা দ্বীনের উপর চলার জন্য নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবার জন্য অর্জন করার অপরিহার্য। অপরিহার্য হওয়ায় তা শেখা ও শিক্ষাদান করাও জরুরি ও ঈমানী দায়িত্ব।

ফরজ ইলমের স্তর: ফরজ ইলমের দুটি স্তর রয়েছে।

১. ফরজে আইন,

২. ফরজে কেফায়া।

১. ফরজে আইন: ফরজে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। ঈমান-আকীদা, ইবাদত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাত সহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমান ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্থদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি।

২. ফরজে কেফায়া: ফরজে কেফায়া বলা হয় যা স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর ফরজ না হলেও সামষ্টিকভাবে সকলের উপর ফরজ। অর্থাৎ সমাজের কিছু ব্যক্তি তা হাসিল করলে সকলের পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। আর কেউই হাসিল না করলে সকলেই দায়ী থাকবে। এ প্রকারের ইলম অনেক বিস্তৃত। এক কথায় দ্বীনের সকল বিষয়ের গভীর জ্ঞান। যেহেতু এটি সামষ্টিকভাবে সকলের উপরই ফরজ তাই সকলকেই এই দায়িত্বের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কেউ যেন মনে না করে, এটি কেবল অমুক শ্রেণির দায়িত্ব। এই ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْغَالِينَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِينَ، وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ .

এই ইলমকে ধারণ করবে প্রত্যেক উত্তর প্রজন্মের আস্থাভাজন শ্রেণি। তাঁরা একে মুক্ত রাখবে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি থেকে, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার থেকে এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে। (শরহু মুশকিলিল আছার, হাদীস ৩৮৮৪)

ফরজে আইন ইলমের প্রকারঃ ফরজে আইন ২ প্রকার।

১. তাৎক্ষণিক ফরজ,

২. পর্যায়ক্রমিক ফরজ।

১. তাৎক্ষনিক ফরজ ইলম: ব্যক্তি যখন যে কাজ বা যে বিষয়ের সম্মুখীন হবে তখনই তার শরয়ী বিধান জেনে নিবে। যেমন: বর্তমানে যে সমস্যা বা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, এর শরয়ী সমাধান কী- তা জেনে নেওয়া। এটি ফরজ ইলমের এমন একটি প্রকার, যা নগদ জানতে হয়, দেরি করার কোনো সুযোগ নেই। তবে ব্যক্তিভেদে প্রয়োজনে

বিভিন্নতা আছে। একেক জনের একেক বিষয়ের ইলম অর্জনের দরকার হয়। পেশা ও কাজ অনুযায়ী যার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রয়োজন পড়ার সম্ভাবনা আছে, সেগুলোর ইলম তাকে আগে থেকেই অর্জন করতে হবে। যেমন: একজন ব্যবসা শুরু করতে যাচ্ছেন। প্রচলিত ব্যবসা বাণিজ্যে হালাল-হারাম দুটোই আছে। তাই ব্যবসা শুরু করার আগে কোনটা হালাল, কোনটা হারাম তা জানা আবশ্যক।

২. পর্যায়ক্রমিক ফরজ ইলম: ফরজ ইলমের কিছু বিষয় আছে এমন যেগুলো জীবনভর প্রয়োজন হয় তবে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে শেখা সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে শিখতে হয়। যেমন: কুরআন কারীমের সহীহ-শুদ্ধ তিলাওয়াত শেখা ইত্যাদি। ঈমান আনা ও ইসলাম সম্পর্কে বোধ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই ফরজ ইলমের এই অংশের জ্ঞান অর্জন করা শুরু করতে হবে। একদিনে, এক সপ্তাহে বা একমাসে জরুরি ইলমের এই অংশ শিখে শেষ করা যায় না। আর স্বল্প সময়ে সব শিখে ফেলার কথা শরীয়তও বলে না। তাই তা ধারাবাহিক ভাবে ইলম অর্জনের সাথে লেগে থেকে অল্প অল্প করে শিখতে হয়। ফরজ ইলমের এই অংশ যতক্ষণ বাকি থাকবে, ততক্ষণ তা শেখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।
এখানে উভয় প্রকার ফরজ ইলমের পরিমান অনেক বেশি। বিশেষ গুরুত্ব সহকারে, দীর্ঘ সময় ব্যয় করে ইলম অর্জন করতে হয়, তা না হলে ইলমের গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

ইলমের উদ্দেশ্য

ইলম অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কি আদেশ করেছেন আর কি নিষেধ করেছেন তা জানা এবং সে ইলম অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আর জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার ইবাদাত করবে। (সূরাঃ ৫১/ আয-যারিয়াত, আয়াতঃ ৫৬)

গুটিকতক কিতাবের মা'লুমাত হাসিল করার নাম ইলম নয়। সাহাবায়ে কেরাম যা শিখতেন সাথে সাথে আমল শুরু করে দিতেন আর এটিই হলো ইলম। তারা এক আয়াত শিখতেন তা আমলে পরিণত করে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন। *হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) বলেছেন: "সূরায়ে বাকারা শিখতে আমার দু'বছর লেগেছে।"*
একজন আরবের সূরায়ে বাকারা শিখতে দু' বছর লাগার একটাই কারণ হলো, এক আয়াত পড়তেন, আমলে অভ্যস্ত হয়ে দ্বিতীয় আয়াত শুরু করতেন।
ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য আল্লাহকে পাওয়া। হযরত হাফেজ্জী হুযূর একটা শের পড়তেন,

جز یاد دوست ہرچہ کنی عمر ضائع است + جز سر عشق ہرچہ بگوئی بطالت استسعدیؔ
بشولوح دِل از نقش غیر حق + علمے کہ راہ حق ننماید جہالت است

আল্লাহর যিকির ছাড়া যত কিছুই তুমি কর, তোমার জীবন বৃথা/ আল্লাহর ইশক ছাড়া যত কিছুই তুমি অর্জন কর, সবই বেকার/ সা'দী! হৃদয় থেকে মুছে ফেল গায়রুল্লাহর নাম/ যে ইলম আল্লাহর পথ না দেখায়, সে ইলম জাহালত ছাড়া কিছুই না।
ইলম অর্জনের আগে এই ৩টি উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
১. নিজের মূর্খতা দূর করে ইলমের নূর দ্বারা নিজেকে আলোকিত করা।
২. ইলম শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে অন্যের মূর্খতা দূর করে অন্যকে ইলমের নূর দ্বারা সুসজ্জিত করা।
৩. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দ্বীনকে কেউ আক্রমণ করতে আসলে তা প্রতিরোধ করা।
তাই শুধু ইলম নয় বরং সব কাজের আগে নিয়ত যেন দুনিয়া কেন্দ্রিক না হয় বরং ইলম অর্জনের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি লাভ করা।

ইলমের গুরুত্ব

ইসলামে ইলমের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামের প্রতিটি অংশের মধ্যেই ইলম বিরাজমান। ব্যক্তির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম জড়িয়ে আছে। ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার আদেশ নিষেধ সঠিকভাবে পালনের জন্য ইলম অর্জনের কোনো বিকল্প নেই। তাই ইলম ছাড়া যথাযথভাবে ইসলাম পালনও সম্ভব নয় এবং ইসলাম থেকে

ইলমকে আলাদা করাও অসম্ভব। পবিত্র কুরআনের পুরোটাই ইলম। পৃথিবীতে যত ধরনের ইলম আছে তা সবই কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত এবং কিয়ামত পর্যন্ত যত ধরনের ইলম আসবে তাও কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত। যদিও কুরআনের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের হিদায়াত, কিন্তু কুরআন যেহেতু আল্লাহ তাআলার বাণী তাই সব ধরনের ইলম এর ইশারা কুরআনের মধ্যে রয়েছে। সেটি যত উন্নত বিজ্ঞানই হোক না কেন। তবে কুরআন এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্বীন শিক্ষা। তাই দ্বীন ইসলাম বুঝার মৌলিক বিষয়গুলো কুরআন ও হাদিস থেকেই পাওয়া যায়। কুরআন শিক্ষা করা, শিক্ষা দেওয়া, কুরআনের তালীম দেওয়া সবকিছুই ইলম চর্চার মধ্যে শামিল। কুরআনকে আঁকড়ে ধরার ব্যাপারে যত জায়গায় বলা হয়েছে তার মধ্যে কুরআনের ইলম অর্জন করার বিষয়টি আবশ্যকীয়ভাবেই অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِى ٱلْأُمِّيِّـۧنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَـٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَـٰلٍ مُّبِينٍ

তিনিই নিরক্ষরদের মাঝে পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে তাদেরই মধ্য হতে, যে তাদের কাছে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে, তাদেরকে পবিত্র করে, আর তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয় অথচ ইতোপূর্বে তারা ছিল স্পষ্ট গুমরাহীতে নিমজ্জিত। (সূরাঃ ৬২/ আল-জুমু'আ, আয়াতঃ ২)

আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) বলেন, ইলমের চেয়ে অন্য কোনো আমল যদি আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় হতো তবে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেটা বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দিতেন। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস বৃদ্ধির জন্য দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

অতঃপর ইলমের ফজিলত বর্ণনার মাধ্যমেও বুঝা যায় যে ইলম কত গুরুত্বপূর্ণ।

ইলমের ফজিলত

১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পবিত্র কুরআনে ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق ، اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَم، الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَم، عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَم.

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' থেকে। পড়, আর তোমার রব মহামহিম। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরাঃ ৯৬/ আল-আলাক, আয়াতঃ ১-৫)

২. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রথম সৃষ্টি কলম: আল্লাহ প্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন এবং কলম ইলম অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

ওবাদাহ বিন ছামেত (রঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ فَقَالَ اكْتُبْ. فَقَالَ مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبِ الْقَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الأَبَدِ

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে তাকে আদেশ করেন, 'লিখ'। কলম বলল, কি লিখব? তিনি বললেন, তাক্বদীর লিখ, যা হয়েছে এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা হবে সবকিছুই'। (মিশকাতুল মাসাবিহ, হাদিস ৯৪)

৩. ইলম অন্বেষণ করা ফরজ: ইলম অর্জন করা ফরজ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَىٰكُم

অতএব জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। তুমি ক্ষমা চাও তোমার ও মুমিন নারী-পুরুষদের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং নিবাস সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। (সূরাঃ ৪৭/ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১৯)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা 'ঈমান ও আমলের' পূর্বে ইলম অর্জনকে আবশ্যক করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ। (সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস ২২৪)

৪. ইলম সকল ইবাদতের মূল: যে কোন আমল আল্লাহর কাছে কবুলযোগ্য হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে: (১) আক্বীদা বিশুদ্ধ হওয়া (২) তরীকা সঠিক হওয়া এবং (৩) ইখলাসে আমল। অর্থাৎ কাজটি নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য হতে হবে। এগুলো বিস্তারিত জানার জন্য ইলমের প্রয়োজন।
সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ) বলেন, 'ইলম অর্জন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ'। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা দ্বীনের বুঝকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের সমতুল্য করেছেন। বরং তদপেক্ষা বেশী। কারণ ইলম ছাড়া মুজাহিদ জিহাদ করতে পারে না; মুসল্লী সালাত আদায় করতে পারে না; যাকাত আদায়কারী যাকাত দিতে পারে না; সায়েম সিয়াম পালন করতে পারে না; হাজী হজ্জ করতে পারে না; ওমরাহকারী ওমরাহ করতে পারে না; খাদ্য গ্রহণকারী খাদ্য খেতে পারে না; পানকারী পান করতে পারে না; ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমাতে পারে না; জাগ্রত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগতে পারে না। তাই ইলম হলো সবকিছুর মূল। (মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-উসায়মিন: শরহ রিয়াযিছ ছালেহীন (রিয়াদ: দারুল ওতান, ১ম প্রকাশ ১৪২৮ হি:) ৫/৪১৩-৪১৪)

৫. ইলম হলো নূর: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَـٰبٌ مُّبِي

অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (সূরাঃ ৫/ আল-মায়েদা, আয়াতঃ ১৫)। এই নূর দ্বারা কুরআনই উদ্দেশ্য। এই নূর আল্লাহর তরফ থেকে আসে। এই নূর দ্বারা মানুষের জীবন আলোকিত হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনের অন্য আয়াতে বলেছেন,

وَ كَذٰلِكَ اَوۡحَيۡنَاۤ اِلَيۡكَ رُوۡحًا مِّنۡ اَمۡرِنَا ؕ مَا كُنۡتَ تَدۡرِیۡ مَا الۡكِتٰبُ وَ لَا الۡاِيۡمَانُ وَ لٰكِنۡ جَعَلۡنٰهُ نُوۡرًا نَّهۡدِیۡ بِهٖ مَنۡ نَّشَآءُ مِنۡ عِبَادِنَا ؕ وَ اِنَّكَ لَتَهۡدِیۡۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيۡمٍ

অনুরূপভাবে আমি তোমার কাছে আমার নির্দেশ থেকে 'রূহ'কে ওহী যোগে প্রেরণ করেছি। তুমি জানতে না কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয় তুমি সরল পথের দিক নির্দেশনা দাও। (সূরাঃ ৪২/ আশ-শূরা, আয়াতঃ ৫২)।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরও বলেছেন,

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَـٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِ

যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তার জন্য নির্ধারণ করেছি আলো, যার মাধ্যমে সে মানুষের মধ্যে চলে, (সূরাঃ ৬/ আল-আন'আম, আয়াতঃ ১২২)

৬. ইলমওয়ালা ব্যক্তি ইলমের নূর দ্বারা অন্যদের আলোকিত করে: *এক লোক ছিল। সে নিরানব্বই লোককে হত্যা করেছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, এ দুনিয়াতে সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান লোক কে? তাকে এক আলিম দেখিয়ে দেয়া হয়। সে তার নিকট এসে বলল যে, সে নিরাব্বই লোককে হত্যা করেছে। এমতাবস্থায় তার জন্য কি তওবা আছে? আলিম বলল, না। তখন সে আলিমকেও হত্যা করে ফেলল। সুতরাং সে আলিমকে হত্যা করে একশ সম্পূর্ণ করল। অতঃপর সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, এ দুনিয়াতে সবচেয়ে জ্ঞানী কে? তখন তাকে জনৈক আলিম লোকের সন্ধান দেয়া হলো। সে আলিমকে বলল যে, সে একশ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, তার জন্য কি তওবা আছে? আলিম লোক বললেন, হ্যাঁ। এমন কে আছে যে ব্যক্তি তার মাঝে ও তার তাওবার মাঝে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে? তুমি অমুক দেশে যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন আছে। তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদাতে লিপ্ত হও। নিজের ভূমিতে আর কক্ষনো প্রত্যাবর্তন করো না। কেননা এ দেশটি ভয়ঙ্কর খারাপ। তারপর সে চলতে লাগল। এমনকি যখন সে মাঝপথে পৌঁছে তখন তার মৃত্যু আসলো। (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৭৬৬)*

সুতরাং, আলিম ব্যক্তি তার ইলমের আলো দ্বারা সেই ব্যক্তিকে তওবার পথে আলো দেখালো। অতঃপর সেই তওবাকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সময় রহমতের ফেরেশতা তার রূহ কবজ করে নিলেন।

৭. কুরআন মুখস্থকারীর মর্যাদা: যে শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কালাম হিফজ করবে তার মর্যাদার ব্যাপারে বলা হয়, *মুসাদ্দাদ (রহঃ) ...... আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ কিয়ামতের দিন কুরআনের পাঠককে বলা হবে, তুমি তা পাঠ করতে থাক এবং উপরে চড়তে (উঠতে) থাক। তুমি তাকে ধীরেসুস্থে পাঠ করতে থাক, যেরূপ তুমি দুনিয়াতে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বশেষ বসবাসের স্থান (জান্নাত) ঐটিই যেখানে তোমার কুরআনের আয়াত শেষ হবে। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৪৬৪)*।

আয়াত যত আগাবে, ফজিলতও ততো বাড়বে। এক আয়াত পড়বে, এক মর্যাদা বুলন্দ হবে। এভাবে হতেই থাকবে। ইলমের কি মর্যাদা ও ফজিলত!

৮. সর্বোত্তম ব্যক্তি সে যে ইলম শিক্ষা দেয়: *উসমান (রঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৫০২৭)*

৯. ইলম অর্জন করা ব্যক্তিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করেন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। (সূরাঃ ৫৮/ আল-মুজাদালা, আয়াতঃ **১১***)*

১০. ইলম হলো আক্বীদা ও আমল সহীহ হওয়ার ভিত্তি: ইলম হলো কথা ও কাজের পূর্বশর্ত। হাফেজ ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

إن العلم إمام العمل، وقائد له، والعمل تابع له ومؤتم به، فكل عمل لايكون خلف العلم مقتديا به فهو غير نافع لصاحبه، بل مضر عليه، كما قال بعض السلف: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

নিশ্চয় ইলম আমলের নেতা ও তার পরিচালক। আর আমল ইলমের অনুগামী ও তার অনুসারী। আমল যদি ইলমের পিছনে না থাকে এবং তার অনুসারী না হয় তাহলে তা তার জন্য উপকারী হবে না। বরং তার জন্য ক্ষতিকর হবে। যেমন কোন সালফ বলেছেন, ইলম ছাড়া যে আল্লাহর ইবাদত করে সে কল্যাণের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে। (মিফতাহু দারিস সা'আদাহ পৃঃ ২)

১১. জ্ঞানের মর্যাদা ইবাদাতের চাইতেও বেশি: *আবূ উমামাহ্ আল-বাহিলী (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, দু'জন লোকের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আলোচনা করা হলো। তাদের একজন আবিদ (সাধক) এবং অন্যজন আলিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার যতখানি মর্যাদা, ঠিক তেমনি একজন আলিমের মর্যাদা একজন আবিদের*

উপর। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ, তার ফেরেশতাগণ এবং আসমান-যমীনের অধিবাসীরা, এমনকি গর্তের পিপড়া এবং পানির মাছ পর্যন্ত সেই ব্যক্তির জন্য দু'আ করে যে মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়। (তিরমিযী, হাদিস ২৬৮৫)

১২. ইলম পানাহারের চেয়ে অধিক জরুরি: মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যেমন পানাহারের প্রয়োজন তেমনি ইলমের প্রয়োজন তার চেয়ে অনেকগুণ বেশী। এমনকি খাদ্যের মাঝে হালাল-হারাম জানতে হলেও ইলমের শরণাপন্ন হতে হবে। তাই ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন,

الناس مُحْتَاجُون إلى العِلْم أكثر مِن حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب يُحْتَاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعِلْم يُحْتَاج إليه بِعَدَد الأنفاس

'মানুষের পানাহারের চেয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন বেশী। কারণ খাদ্য ও পানীয় দিনে একবার বা দু'বার প্রয়োজন। আর জ্ঞানের প্রয়োজন শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা পরিমাণ'। (মাদারিজুস সালেকীন ২/৪৭০)

১৩. নবীগন ইলমের উত্তরাধিকার: প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারীরা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হন। নবীগণ মৃত্যুর সময় মীরাছ হিসাবে ইলম রেখে গেছেন। তাই যারা ইলম অর্জন করতে পারল তারাই নবীগণের প্রকৃত উত্তরাধিকার হলো। আবুদ দারদা (রঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

'অবশ্যই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিস। আর নবীগণ উত্তরাধিকার হিসাবে কোন দীনার বা দিরহাম রেখে যাননি, বরং তাঁরা মীরাস হিসাবে রেখে গেছেন ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি ইলম লাভ করেছে, সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে'। (আবু দাউদ, হাদিস ৩৬৪১)

১৪. ইলমের সওয়াব মৃত্যুর পরও জারি থাকে:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়ঃ ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ, তার রেখে যাওয়া এমন ইলম, যা দ্বারা উপকার সাধিত হয় এবং এমন সৎ সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে"। (মুসলিম, হাদিস ৪৩১০)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لاِبْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ" .

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঈমানদার ব্যাক্তির মৃত্যুর পর তার যেসব কাজ ও তার যেসব পুণ্য তার সাথে যুক্ত হয় তা হলো: যে জ্ঞান সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার করেছে, তার রেখে যাওয়া সৎকর্মপরায়ণ সন্তান, কুরআন যা সে ওয়ারিসী সূত্রে রেখে গেছে অথবা মাসজিদ যা সে নির্মাণ করিয়েছে অথবা পথিক-মুসাফিরদের জন্য যে সরাইখানা নির্মাণ করেছে অথবা পানির নহর যা সে খনন করেছে অথবা তার জীবদ্দশায় ও সুস্থাবস্থায় তার মাল থেকে যে দান-খয়রাত করেছে তা তার মৃত্যুর পরও তার সাথে (তার আমলনামায়) যুক্ত হবে। (আবু দাউদ, হাদিস ৩৬৪১)

১৫. ইলমের ব্যাপারে ঈর্ষা: আল্লাহ (তার বান্দাগণকে) যেগুলো নি'আমত দান করেছেন, সেগুলোর মধ্য থেকে কোন নি'আমতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাউকে কারও প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দেননি। তবে দু'টি নি'আমতের ব্যাপারে (একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছেন)।

ক. ইলম অন্বেষণ করা এবং তা অনুযায়ী আমল করা।

খ. এমন ব্যবসায়ী, যে তার সম্পদ ইসলামের কাজে প্রদান করে।

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দু' প্রকারের লোক ছাড়া কারো সাথে ঈর্ষা পোষণ করা যায় না। এক প্রকারের লোক হলো- যাকে আল্লাহ অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন এবং হাক্ব পথে তা ব্যয় করার তাওফীক তাকে দিয়েছেন। আর অন্য ব্যক্তি হলো যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা হিকমাহ বা সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। সে তদনুযায়ী কাজ করে এবং তা অন্যদের শিক্ষা দেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদিস ৮১৬)

১৬. ইলম স্থায়ী হয় আর সম্পদ ফুরিয়ে যায়: *হযরত আলী (রঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ইলমের মর্যাদা বেশি না সম্পদের? তিনি বলেছিলেন: ইলম। পুনরায় প্রশ্ন করা হয়েছিল: এর প্রমাণ কি? তিনি বলেছিলেন: ইলম হল নবীগণের "মিরাস"। আর সম্পদ হলো ফেরাউনের উত্তরাধিকার।* ইলম ও সম্পদের পার্থক্য হলো ইলমের দ্বারা বন্ধুত্ব বাড়ে, আর সম্পদের কারণে শত্রুতা বাড়ে। ইলম চুরি হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, অথচ সম্পদের কোনো নিরাপত্তা নেই। ইলম পুরাতন হলে পাকাপোক্ত হয় আর সম্পদ পুরাতন হলে তার দাম কমে যায়। ইলমের অধিকারী ব্যক্তির মর্যাদা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে আর সম্পদশালীর বাড়ে লাঞ্ছনা। খরচ করার দ্বারা ইলম বাড়ে, পক্ষান্তরে সম্পদ খরচ করলে তা ফুরিয়ে যায়। পরকালে ইলমের কোন হিসাব দিতে হবে না, অথচ সম্পদের হিসাব দিতে হবে কড়ায় গন্ডায়। ইলমের দ্বারা অন্তর আলোকিত হয়, অথচ সম্পদের দ্বারা অন্তর অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়। ইলম মানুষকে হেফাজত করে আর মানুষ হেফাজত করে ইলমকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপুল ইলমের অধিকারী হতে পেরেছিলেন বলে আল্লাহর দরবারে বলতে পেরেছিলেন: "*হে আল্লাহ! আমি আপনার ইবাদাতের হক আদায় করতে পারিনি।*" পক্ষান্তরে ফিরাউন সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে ঘোষণা করেছিল, আমি তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভু।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে সম্পদের দ্বারা এই পার্থিব জীবনে বেশ কিছু উপকার সাধিত হয়। তবে এ সম্পর্কে যে মানুষের সকল সংকট দূর করতে পারে তাও নয়। যেমন: সম্পদের বিনিময় মানুষ একটি চশমা কিনতে পারে কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কিনতে পারে না। সম্পদের বিনিময়ে নরম বিছানা কিনতে পারে কিন্তু ঘুম কিনতে পারে না। সম্পদের দ্বারা বই-পুস্তক কিনতে পারে কিন্তু ইলম কিনতে পারেনা। সম্পদের বিনিময়ে তোষামোদ অর্জন করতে পারে কিন্তু কারো অন্তরের ভালোবাসা লাভ করতে পারেনা। সম্পদের দ্বারা অলংকার কিনতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য কিনতে পারেনা। সম্পদের বিনিময়ে চাকর-বাকর জোগাড় করতে পারে কিন্তু সন্তান আনতে পারে না। সম্পদের বিনিময়ে খেজাব (কলব) লাগাতে পারে কিন্তু যৌবন ফিরিয়ে আনা যায় না। প্রতিটি মানুষের কর্তব্য হলো সম্পদ নয় বরং জ্ঞান অর্জন করা। ইলম ও জ্ঞানের দ্বারাই এই দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত জীবন লাভ করা যায়।

১৭. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যার কল্যাণ চান তাকে ইলম দান করেন: মু'আবিয়াহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনী জ্ঞান দান করেন'। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৭১)

আর যাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা জ্ঞান দান করেন তাকেই মূলতঃ সব দিক থেকে কল্যাণ দান করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

يُؤْتِى ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

তিনি যাকে চান প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয়, তাকে অনেক কল্যাণ দেয়া হয়। আর বিবেক সম্পন্নগণই উপদেশ গ্রহণ করে। (সূরাঃ ২/ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২৬৯)

১৮. ইলম হলো জমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়: *আবূ মূসা (রঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে যে হিদায়াত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল যমীনের উপর পতিত প্রবল বর্ষণের ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; তারা নিজেরা পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তা দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি রয়েছে যা একেবারে মসৃণ ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হলো সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাতে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিখায়। আর সে ব্যক্তিরও দৃষ্টান্ত- যে সে দিকে মাথা তুলে দেখে না এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার যে হিদায়াত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৭৯)*

১৯. ইলম জান্নাতের পথ:

আবূ হুরাইরাহ (রঃ) এর বর্ণিত হাদিস তার প্রমাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ
আর যদি কোন ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বের হয়, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তির জন্য জান্নাতের দিকে রাস্তা সহজ করে দেন। (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৬৯৯)

২০. ইলম অর্জন জিহাদের ন্যায়: জিহাদ শুধু ঢাল-তরবারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং ইলম অর্জনও এক প্রকার জিহাদ; বরং এটিই সকল জিহাদের মূল। কারণ ইলম ছাড়া কোন জিহাদই সঠিক হবে না।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ " مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا لَمْ يَأْتِهِ إِلاَّ لِخَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ جَاءَ لِغَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إِلَى مَتَاعِ غَيْرِه" .
আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যাক্তি আমার এই মসজিদে কোন উত্তম বিষয় শিক্ষা দানের জন্য বা শিক্ষা লাভের জন্য আসে, সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তির মর্যাদাসম্পন্ন স্থানীয়। আর যে ব্যক্তি ভিন্নতর উদ্দেশ্যে আসে, সে অপরের সম্পদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপকারীর তুল্য। (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৭)

২১. ইলম অর্জন হলো আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া: হাদিস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার রাস্তা বলা হয়েছে।
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ" .
আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি জ্ঞানের খোজে বের হলে সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার রাস্তায় আছে বলে গণ্য হবে। (তিরিমিযী, হাদিস ২৬৪৭)

২২. ইলমের কারণে বান্দা রিযিক প্রাপ্ত হয়:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

আনাস ইবনু মালিক (রঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত থাকত এবং অন্যজন আয়-উপার্জনে লিপ্ত থাকত। কোন একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই উপার্জনকারী ভাই তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। তিনি তাকে বললেনঃ হয়তো তার ওয়াসীলায় তুমি রিযিকপ্রাপ্ত হচ্ছো। (তিরমিযী, হাদিস ২৩৪৫)

২৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবরে নামানোর সময় আলেমকে অগ্রাধিকার দিতেন:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ ثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ فَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُم

জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের শহীদগণের দু’ দু’জনকে একত্র করে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কুরআন সম্পর্কে কে অধিক জ্ঞাত? দু’জনের কোন একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে প্রথমে তাঁকে কবরে রাখতেন। অতঃপর ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন আমি তাঁদের জন্য সাক্ষী হব। তিনি রক্ত-মাখা অবস্থায়ই তাঁদের দাফন করার আদেশ করলেন এবং তাঁদের গোসলও দেননি। (সহীহ বুখারী, হাদিস ১৩৫৩)

২৩. তালিবুল ইলমকে ফেরেশতাগন বেষ্টন করে রাখেন: *হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালিবুল ইলমকে মারহাবা। নিশ্চয় তালিবুল ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়।*

এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে। (আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদিস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদিস ৫৫০)

২৪. আলেম ও গাইরে আলেম এক নয়: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

هَلۡ يَسۡتَوِى ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ

যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' (সূরাঃ ৩৯/ আয-যুমার, আয়াতঃ ৯)

وَمَا يَسۡتَوِى ٱلۡأَعۡمَىٰ وَٱلۡبَصِيرُ

অন্ধ আর চোখওয়ালা সমান নয়।

وَلَا ٱلظُّلُمَٰتُ وَلَا ٱلنُّورُ

আর অন্ধকার ও আলোও (সমান নয়)।

وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلۡحَرُورُ

আর ছায়া ও রোদও (সমান নয়)।

وَمَا يَسۡتَوِى ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوَٰتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسۡمِعُ مَن يَشَآءُ ۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٍ مَّن فِى ٱلۡقُبُورِ

আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন শোনান; যারা ক্ববরে আছে তুমি তাদেরকে শোনাতে পার না। (সূরাঃ ৩৫/ ফাতির, আয়াতঃ ১৯-২২)

قُل لَّا يَسۡتَوِى ٱلۡخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوۡ أَعۡجَبَكَ كَثۡرَةُ ٱلۡخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَٰٓأُوْلِى ٱلۡأَلۡبَٰبِ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

বল, অপবিত্র আর পবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্র বস্তুর প্রাচুর্য তোমাকে আকৃষ্ট করে। কাজেই হে জ্ঞানী সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (সূরাঃ ৫/ আল-মায়েদা, আয়াতঃ ১০০)

أَفَمَن يَعۡلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ ٱلۡحَقُّ كَمَنۡ هُوَ أَعۡمَىٰٓ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

যে ব্যক্তি জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যে অন্ধ? বুদ্ধিমান লোকেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (সূরাঃ ১৩/ আর-রাদ, আয়াতঃ ১৯)

ইলমের অন্বেষণের বিধান

দ্বীনের ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফারজ। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ২২৪)

দুনিয়াতে চলার জন্য, ইবাদত করার জন্য, দ্বীনের খেদমত ও দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ইলম অর্জন করা অপরিহার্য। কারণ একজন প্রকৃত আলেম একটি জাতি বা দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। আবার কথা ও কাজের পূর্বেও জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীতে একটি অনুচ্ছেদে শিরোনাম দিয়েছেন,

باب العِلمِ قبْلَ القوْلِ والعمل

সকল কথা ও আমলের আগে হচ্ছে সেই বিষয়ের ইলম এবং তার প্রমাণে কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله

'সুতরাং জেনে রেখ, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই।' (সূরাঃ ৪৭/ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ১৯ ;) সহীহ বুখারী পৃঃ ১৬

মানুষ যখন কোনো ইবাদত করার ইচ্ছে করে এবং যে মুআমালাত ও মুআশারাত সম্পন্ন করার ইচ্ছে করে তখন সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক হয়ে যায়। এ অবস্থায় তার উপর জানা আবশ্যক কিভাবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ ইবাদতটি করবে এবং কিভাবে মুআমালাত ও মুআশারাত সম্পন্ন করবে। যেমন: একজন ছেলে মেয়ে বালেগ বালেগা হয়েছে। তার উপর নামায, রামাদানে রোজা ফরজ হয়েছে। এখন নামায ও রোজা সংক্রান্ত যত ইলম-মাসআলা আছে তা জানা তার উপর ফরজ। অর্থ-সম্পদ হলে তার উপর যাকাত, কুরবানী ও হজ্ব সংক্রান্ত সকল ইলম-মাসআলা জানা ফরজ। তাই জীবনে যে পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে সেই সম্পর্কে ইলম অর্জন করা আবশ্যক।

ইলম অন্বেষণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমলের অন্তর্ভুক্ত, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার অন্তর্ভুক্ত। কিছু এমন বিদআত সমূহ যখন শুরু হয় যা বিশেষ করে এ যুগে ইসলামী সমাজে প্রকাশিত হয় এবং অধিক হারে ছড়িয়ে পড়ে তখন ইলম ছাড়া ফতওয়া প্রদান করতে চাওয়া লোকদের দ্বারা অধিক মূর্খতা শুরু হয়

এবং অধিকাংশ লোকের মাঝে বিতর্ক শুরু হয় ফলে তখন এই বিষয়গুলো দ্বীনের সঠিক ইলম অন্বেষণের ব্যাপারে তরুণ সমাজকে বাধ্য করলো। দ্বীনের সঠিক ইলম সঠিক পথ দেখায় তাই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে এমন জ্ঞানী আলিম ব্যক্তি বর্গের নিকটে যেতে হবে, যাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দ্বীনের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান রয়েছে, পর্যাপ্ত গবেষণার যোগ্যতা রয়েছে, আল্লাহর বান্দাদেরকে দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা রয়েছে। *দ্বীনের ইলম অর্জনের হুকুম সম্পর্কে ইবনে উসাইমিন (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন,শর'য়ী জ্ঞান অর্জন করা ফরজে কিফায়া, যা যথেষ্ট পরিমাণ ব্যক্তি আদায় করলে অন্যদের বেলায় সুন্নাত হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় সকল মানুষের উপর জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক তথা ফরজে আইন হয়ে যায়।* যেমন: কোনো মানুষ যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কোন ইবাদত করতে চায়, তাহলে তার উপর জেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায় যে, কীভাবে সে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য এই ইবাদতটি করবে এবং এর মতো আরও (আল্লাহর উদ্দেশ্যে) অন্যান্য ইবাদত করার পদ্ধতি সম্পর্কে জানাও আবশ্যক তথা ফরজে আইন। সুতরাং *যাকে তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন-পূরণ শর'য়ী জ্ঞান অর্জন করা থেকে বিরত রাখে, অথচ সে আবশ্যকীয় ইবাদতের ব্যাপারে যত্নবান, তার ব্যাপারে বড়দের হল, এটি ওজর বলে গণ্য হবে এবং তার কোন পাপ হবে না। কিন্তু তার জন্য উচিত হবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী শর'য়ী জ্ঞান অর্জন করা। (ইবনু 'উসাইমীন ফতোয়া ইসলামীয়া: ১/১৭৪)*

শাইখ সালেহ আল ফাওযান (হাফি.) বলেন: "দাঈ' হওয়ার পূর্বশর্ত হলো ইলম অর্জন করা। ইলম অন্বেষণ সবার আগে। বিশেষ করে তাওহীদ-শিরক ও হালাল-হারাম বিষয়ে ইলম থাকা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ইলম যদি না থাকে, তাহলে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বানে সক্ষম হবে না। আর যদি ইলম ছাড়া দাওয়াত দিয়ে থাকে তাহলে সে ভুল করবে।

ইলম অর্জনের মূলনীতি

১. আমি জানি না -لَا أَدْرِى: একজন তালিবুল ইলমের বৈশিষ্ট্য হবে যে সে জ্ঞান অর্জন করার শুরুতে তার মন-মগজে গেঁথে নিবে যে আমি জানিনা, আমার জানার কমতি আছে। আমার এই না জানার কারণে আমাকে ইলম অর্জন করতে হবে। বর্তমানে যে জানে বা অল্প জানে তিনিও ভাবে সে অনেক জানে। "অনেক জানি'' এই বিষয়টি হচ্ছে জ্ঞান অর্জনের পথে সর্বপ্রথম বাধা। একজন তালিবুল ইলম যখন "আমি কিছু জানিনা'' বলে নিজের ভেতর জানার স্পৃহা তৈরি করবে তখন সে জ্ঞানের সৌন্দর্য নিজের মাঝে ধারণ করতে পারবে।

২. সফর করা: ইলম অর্জনের জন্য সফর করতে হবে। পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীনদের জীবনি থেকে দেখা যায় ওনারা ইলমের জন্য এক শহর থেকে আরেক শহর, এক দেশ থেকে আরেক দেশে লম্বা সফর করেছেন। পবিত্র কুরআনে এসেছে,

قَالَ مُوْسٰى لِفَتٰىهُ لَاۤ اَبۡرَحُ حَتّٰۤى اَبۡلُغَ مَجۡمَعَ الۡبَحۡرَيۡنِ اَوۡ اَمۡضِىَ حُقُبًا

মূসা তার সঙ্গীকে বলেছিল, 'দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে পৌঁছা না পর্যন্ত আমি চলতেই থাকবো যদিও বছরের পর বছর চলতেও হয়।' (সূরাঃ ১৮/ আল-কাহফ, আয়াতঃ ৬০)। এই থেকে বুঝা যায়, যে জিনিস অর্জন করতে চাচ্ছে সে জিনিস যতক্ষন না অর্জন হচ্ছে ততক্ষন পর্যন্ত অর্জন করার যাত্রা অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. ইলম অর্জনের পথে কষ্ট-মুজাহাদা: ইলম অর্জনের পথে অনেক কষ্ট মুজাহাদা করতে হবে। যতটুকু চেষ্টা করবে ততটুকু অর্জন করতে পারবে। প্রসিদ্ধ আছে,

اَلْعِلْمُ شَيْءٌ لا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ كُلَّك

ইলম এমন একটি জিনিস, সে তোমাকে তার কিছু অংশও দিবে না যতক্ষণ না তুমি নিজেকে পূর্ণভাবে তার কাছে সমর্পণ না করবে। (খতিব বাগদাদী, আলজামি: ১৫৭০)

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

أخي لن تنال العلم إلا بستة سأبينك عن تفصيلها ببيان ذكاء و حرص و اجتهاد و بلغة و صحبة أستاذ و طول زمانالإمام الشافعي (رحمة الله عليه)

হে ভাই, ৬ টি বিষয় ছাড়া কক্ষনো জ্ঞানী হতে পারবে না। আমি তোমাকে এই সম্পর্কে অচিরেই বর্ণনা করে জানাব। সেগুলো হলো:

১)الذكاء বা মেধা।

২)حرص বা প্রচন্ড আগ্রহ।
৩)اجتهاد। বা চেষ্টা-প্রচেষ্টা।
৪)بلغة বা জীবন ধারণের জন্য যতটুকু সম্পদ থাকা প্রয়োজন, ততটুকু সম্পদ থাকা।
৫)صحبة أستاذ বা উস্তাদের সহবত।
৬)طول زمان বা দীর্ঘ সময়।

৪. শয়তানের ফাঁদে পা না দেওয়া: শয়তান তালিবুল ইলমকে বিভিন্ন প্ররোচনা দিতে থাকে। তলিবুল ইলমকে নানাভাবে ইলমের পথ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে। একজন সাধারণ মানুষের চেয়ে একজন তালিবুল ইলম সবচেয়ে বেশী শয়তানের সাথে লড়াই করে। কারণ শয়তান জানে একজন তালিবুল ইলম যদি ইলমের শেষ প্রান্তে পৌছে বিজয়ী হয়ে যায় তাহলে শয়তান এরচেয়ে আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। অনেকে খুব আগ্রহ নিয়ে ইলমের পথে এসে কিছু শিখতে যায় কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর মনোবল হারাতে থাকে। এটি শয়তানের স্পষ্ট ধোকা, তাই এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

৫. উস্তাদ নির্বাচন: ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে উস্তাদ নির্বাচন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উস্তাদের কিছু বৈশিষ্ট হলো **১.** যিনি মুত্তাকী-ফরহেজগার হবেন। ২. যে উস্তাদের উস্তাদ আছে। ৩. পারদর্শী অর্থাৎ তালিবুল ইলম যে বিষয়ে যার থেকে ইলম নিতে চাচ্ছে তিনি যেন ওই বিষয়ে পারদর্শী হয়। যেমন: যিনি কুরআনের ইলমে দক্ষ, কুরআনের ইলমের অর্জনের জন্য উনার কাছে যেতে হবে। ফিক্বহের ইলম অর্জন করতে চাইলে যিনি ফিক্বহ বিষয়ে দক্ষ ওনার থেকে ফিক্বহের ইলম অর্জন করতে হবে। বর্তমানে ইলমী জগতের বিশৃঙ্খলার একটি বড় কারণ হলো যিনি আরবী ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করেছে কিন্তু তিনি কথা বলছেন ফিকহ নিয়ে। যিনি ফিক্বহ বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন করেছে তিনি কথা বলতেছেন হাদিস নিয়ে। যার কারণে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।

৬. কল্যানকর ইলম শিক্ষা করা: উস্তাদের কাছে শিক্ষা করা ইলম যেন কল্যাণকর ইলম হয়। সেই কল্যাণকর ইলম যেই ইলমের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন। হাদীসে এসেছে,
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْفَجْرِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِزْقًا طَيِّبًا.»

উম্মু সালামাহ্ (রঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম *ফজরের সালাত আদায় করে বলতেন,*

"আল্ল-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা 'ইলমান না-ফি'আন ওয়া আমলান মুতাকব্বালান ওয়া রিযকন ত্বইয়্যিবা"

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও হালাল রিযক চাই। (মিশকাতুল মাসাবীহ, হাদিস ২৪৯৮)

৭. উস্তাদ যা জানেন তা শেখা: উস্তাদের কাছে এমন বিষয় শেখা যা উস্তাদ নিজেও ওনার উস্তাদের কাছে শিখেছেন। যে ইলম উস্তাদ নিজেও শিখেন নাই তা শেখা যাবে না। তা না হলে ভুল শেখার সম্ভাবনা আছে যা ফিতনার কারণ হতে পারে।

৮. উস্তাদের সাথে আদব রক্ষা করা: উস্তাদের সাথে সব সময় আদব বজায় রাখতে হবে। আদেশসূচক শব্দ ব্যবহার না করা যেটা আদবের দাবী। উস্তাদ যেভাবে দিক নির্দেশনা দিবে তা মেনে চলা। যখন যে বিষয়গুলো মেনে চলতে ও পরিহার করতে বলবে তখন উনার নির্দেশনা মেনে উস্তাদকে অনুসরণ করতে হবে। তখনই শেখাটা ফলপ্রসূ হবে।

ইলমের শ্রেণিবিভাগ

ইলম ২ প্রকার।

১. উপকারী ইলম,

২. অনুপকারী ইলম।

১. উপকারী ইলম: উপকারী ইলমের কিছু বৈশিষ্ট্য হলো, উপকারী ইলম বান্দার অন্তরে আল্লাহর ভয়কে জাগিয়ে তুলে। উপকারী ইলম তালিবুল ইলমের মাঝে বিনয়ী, তাওয়াজ আনবে। আচার-আচরণ থেকে উদ্ধত ভাব দূর করবে। উপকারী ইলম ইবাদত আমলের প্রতি উৎসাহিত করে। ইবাদত আমলের প্রতি মানুষের যে গড়িমসি অলসতা তা দূর করবে। উপকারী ইলম মানুষকে খ্যাতির হাত থেকে বাঁচায়। তালিবুল ইলম উপকারী

ইলম অর্জন করলে তখন সে প্রসিদ্ধ হওয়ার চেয়ে ইলমকে আমলে রুপান্তরিত করে জান্নাতে যাওয়া মূখ্য উদ্দেশ্য হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপকারী ইলম শেখার এবং শিখানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং আল্লাহর কাছে উপকারী ইলমের জন্য দোয়া শিখিয়েছেন এবং দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিজিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ৯২৫)

শুদ্ধ নিয়ত ও সঠিকভাবে শিখলে দ্বীনি ইলম উপকারী ইলম হবেই। প্রকৃত ইলম হলো দ্বীনের ইলম, এটা না থাকলে ব্যক্তির দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

اِقۡرَاۡ بِاسۡمِ رَبِّكَ الَّذِیۡ خَلَقَ

পড় তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (সূরাঃ ৯৬/ আল-আলাক, আয়াতঃ ১)। রবের নামে পড়লে সেই ইলম উপকার পৌঁছাবে। যেমন: কোনো ব্যক্তি তার জ্ঞানের মাধ্যমে মোবাইল ব্যবহার করে কিন্তু মোবাইললের মাধ্যমে নানারকম খারাপ দৃশ্য, চিন্তা, কথা ব্যক্তির ঈমান-আখলাক নষ্ট করে দিচ্ছে, যা অনুপকারী। যা কিছু ব্যক্তির ক্ষতি করে, দ্বীন-দুনিয়া নষ্ট করে, মন-মস্তিষ্ক নষ্ট করে, ব্যক্তি এমন কিছুতে অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে উপকারী ইলম তাকে বাধা দিবে।

২. অনুপকারী ইলম: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুপকারী ইলম থেকেও পানাহ চেয়েছেন এবং নিজেদেরও অনুপকারী ইলম থেকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নিকট পানাহ চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চারটি বস্তু হতে আশ্রয় চাইঃ এমন জ্ঞান যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় যা ভীত হয় না, এমন আত্মা যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দু'আ যা কবুল হয় না।" (আবূ দাউদ, হাদিস ১৫৪৮)

সেই ইলম ক্ষতিকর যখন কোনো ব্যক্তি দ্বীনি ইলম শিখে সেটার ভুল ব্যবহার করে, ভুল ব্যাখ্যা করে। সে ইলম ব্যক্তির অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তুলতে পারেনি,

আল্লাহর প্রতি বিনয়ী করেনি সে ইলম অনুপকারী ইলম। যে ইলম ব্যক্তিকে অহংকারী বানায়, খ্যাতির লোভে ফেলে দেয় সেই ইলম অনুপকারী ইলম।

ইলম এবং মা'লুমাত এর মধ্যে পার্থক্য

ইলম ও মা'লুমাত অর্থগত দিক থেকে একই হলেও প্রকৃত অর্থে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। ইলমের জায়গা হলো অন্তর অন্যদিকে মালুমাতের জায়গা হলো দেমাগ যা মাথায় থাকে, কিন্তু অন্তরে থাকে না।

আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, ইলম হল ঐ জিনিস যা উপলব্ধি সহ অর্জিত হয় আর মা'লুমাত হলো যা অর্জিত হয় কিন্তু তাতে কোনো উপলব্ধি থাকে না। উপলব্ধিসহ ইলম হলো এ জিনিস যা কেউ জানার পর সে ইলম তাকে আমলের জন্য উদ্বুদ্ধ করে। যেমন: কোনো ব্যক্তি জানতে পারলো যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। সুতরাং যার নামায ঠিক তার সব ঠিক। এই জ্ঞান যখন ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য করবে, আযান হলে দুনিয়ার সব কাজকে একদিকে রেখে, তাকে মসজিদে যেতে বাধ্য করবে তখন সেই জ্ঞানকে ইলম বলা হবে। পক্ষান্তরে এই জ্ঞান যদি নামাযের প্রতি উদ্বুদ্ধ না করে তখন তাকে মা'লুমাত বলা হবে। ব্যক্তি জানে বেপর্দা চলা, সুদ দেওয়া নেওয়া ইত্যাদি হারাম কিন্তু তার এই জানা তাকে এগুলো থেকে বিরত থাকার আমলে উদ্বুদ্ধ করছে না কারণ এগুলোর ইলম তার অন্তরে নেই। সে জানে ঠিকই কিন্তু উপলব্ধী সহ অর্জিত হয়নি, যা মালুমাত। উপলব্ধি সহ ইলমের একটি উদাহরণ হলো:

حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ـ رضى الله عنه ـ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بِيْرُ حَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَىَّ بِيْرُ حَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ شِئْتَ، فَقَالَ " بَخٍ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَائِحٌ. قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا، وَأَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ ". قَالَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.□

ইয়াহ্ইয়া ইবনু ইয়াহ্ইয়া (রহঃ) ... আনাস ইবনু মালিক (রঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদিনায় আনসারদের মধ্যে আবূ তালহাই সবচেয়ে বেশী ধনী ছিলেন এবং তাঁর সম্পদের মধ্যে বায়রুহা তাঁর সবচাইতে প্রিয় সম্পদ ছিল, এটা মসজিদের (নববীর) সম্মুখে অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথায় যেতেন এবং এতে যে উৎকৃষ্ট পানি ছিল তা পান করতেন। যখন এ আয়াত নাযিল হলঃ "তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনো পুণ্য লাভ করবেনা।" (৩ঃ ৯২)। তখন আবূ তালহা (রঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেনঃ তোমরা যা ভালোবাসো, তা থেকে যে পর্যন্ত দান না করবে, সে পর্যন্ত তোমরা প্রকৃত পুণ্য লাভ করবে না। আর আমার সম্পদের মধ্যে বায়রুহা আমার নিকট সব চাইতে প্রিয় সম্পদ। আমি ওটা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দান করে দিলাম। এর সাওয়াব ও প্রতিদান আমি আল্লাহর নিকট প্রত্যাশা করছি। কাজেই ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি ওটাকে যেখানে ভালো মনে করেন, খরচ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বেশ। এটাতো চলে যাবার মত সম্পদ, এটাতো চলে যাবার মত সম্পদ। তুমি এ ব্যাপারে যা বললে, আমি তা শুনলাম এবং আমি এটাই সঙ্গত মনে করি যে, এটা তুমি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বণ্টন করে দিবে। আবূ তালহা (রঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করবো। তারপর আবূ তালহা (রঃ) তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে তা বণ্টন করে দিলেন। (সহীহ বুখারী, হাদিস ২১৬৭)

আবু তালহা (রঃ) এর এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, আবু তালহা (রঃ) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বাণী শুনেই প্রিয় বস্তু দান করে দিলেন। এটাকে বলা হয় ইলম পক্ষান্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বাণী সম্পর্কে জানে কিন্তু সে জেনেও তার প্রিয় বস্তু আঁকড়ে ধরে আছে, এটা হলো মালুমাত।

সুতরাং যে জ্ঞান মানুষের মধ্যে গুনাহের ভয় সৃষ্টি করবে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নাফরমানি থেকে বিরত রাখবে, হেদায়াতের পথে চলতে বাধ্য করবে তা হলো ইলম যা উপলব্ধি সহ অর্জিত হয়। আর যে জ্ঞান গুনাহ থেকে ফিরতে বাধ্য করে না তা শুধু মালুমাত অর্থ্যাৎ যা অর্জিত হয় ঠিকই কিন্তু তাতে কোনো উপলব্ধি থাকেনা।

ইমাম হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন, ইলম দুই প্রকার। ১. একটি হচ্ছে অন্তরের সৌন্দর্য জ্ঞান যা উপকারী জ্ঞান। ২. আরেকটি হচ্ছে মুখের জ্ঞান। যা আদম সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলা পক্ষ থেকে দলীল। (দারেমী, ৩৬৪)
ব্যক্তি অনেক জানে সাথে অনেক গুনাহ করে এটাকে ইলম বলা যাবে না। বরং এই জ্ঞান হাশরে ব্যক্তির বিপক্ষে যাবে।

ইলম অর্জনের আদব

ইলম শেখার আগেই মূলত ইলমের আদব শেখা জরুরি। যে ইলম নিজের আখলাক পরিবর্তন করতে পারে না তা সত্যিকারের ইলম নয়। ইলম প্রকাশ পায় ব্যক্তির আদব, আখলাক আর বিনয়ের মাধ্যমে। এজন্য ইলম শিখার আগে দরকার আদব শিখা। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহঃ) বলেন,

طلبت الأدب ثلاثين سنة، وطلبت العلم عشرين سنة
وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم
আমি ৩০ বছর আদব শিখেছি আর ২০ বছর ইলম শিখেছি এবং সালাফুস সালেহীনরা ইলম শেখার আগে আদব শিখতেন। (গায়াতুন নিহায়া ১/১৯৮)

ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন,

كاد الأدب يكون ثلثي العلم
আদব হচ্ছে ইলমের এক তৃতীয়াংশ। (সিফাতুস সফওয়াহ ১/৪৫)
দ্বীনি ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদবের প্রতিও লক্ষ রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ। নিচে কয়েকটি আদব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:-

১. ইলম অর্জনকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইবাদত মনে করা: ইলম অর্জন করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইবাদত। ইলম অর্জন করার মাধ্যমে অন্যান্য নফল ইবাদতের মতো সওয়াব অর্জিত হবে এই নিয়তে যদি ইলম অর্জন করার চেতনা থাকে তবেই একমাত্র ইলম অর্জনের জন্য ওই মানের প্রয়াস করবে যেটা ইলম অর্জনের জন্য করা জরুরি। এমন চেতনা না থাকলে ৮/১০ জন মানুষের মতো পড়া পড়বে, পড়া শেষ করে প্রতিষ্ঠান থেকে বের হবে কিন্তু জীবনে এর কোনো প্রতিফলন থাকবে

না। কেউ ইলম অর্জন কে ইবাদত মনে করলে মাঝ পথে ছাড়তে পারবে না। যেমন: সালাত ইবাদত। কেউ সালাত শুরু করলে আর পারবেনা বলে ছেড়ে দেয় না, যতোই কষ্ট হোক বাকী নামায শেষ করে। তেমনি ইলম অর্জনও ইবাদত, মাঝ পথে ছেড়ে না দিয়ে অল্প অল্প করে হলেও লেগে থাকতে হবে। ইলম অর্জনের পথে লেগে থাকার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওলামায়ে কেরাম বলেন,

العلم صلاة السر، وعبادة القلب

ইলম হচ্ছে গোপন সালাতের মত। আর এটা অন্তরের ইবাদত। (হিলইয়াতুল তালিবুল ইলম, পৃঃ ১৪১)

২. বিশুদ্ধ নিয়ত: ইলম অর্জন হবে একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য। আলেমদের সাথে তর্কবিতর্ক বা জাহেলদের সাথে গর্ব অহংকার করার জন্য যেন না হয়।

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা আলিমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে ঝগড়া-বিতর্ক করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য (ধর্মীয়) জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যাক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন। (সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭)

শুধুমাত্র নিয়তের কারণে অনেক বড় আমলও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে আবার অনেক ছোট আমলও অনেক বড় হয়ে যেতে পারে। তাই নিয়ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে। (সূরা আল-বায়্যেনা, আয়াতঃ ৫)

উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে, যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে। (সহীহ বুখারী, হাদিস ০১)

নিয়তের বিষয়টি এতোই জরুরি যে, সু নিয়তের উপর নির্ভর করে সওয়ার অর্জিত হয় এবং কু নিয়তের উপর নির্ভর করে গুনাহ হয় আর নিয়ত না করলে কিছুই হবে না। যেমন: কোনো ব্যক্তি বই পড়লো কোনো নিয়ত ছাড়া ফলে তার কোনো সওয়ার অর্জিত হবে না অন্যদিকে একজন নিয়ত করলো "হে আল্লাহ! আমি বইটি পড়া শুরু করতেছি আপনার সন্তুষ্টির আশায়, ইলম অর্জনের জন্য এবং ইলম অনুযায়ী আমল করার জন্য এবং মানুষকে উপকৃত করার জন্য। ফলে একাধিক বিশুদ্ধ নিয়তের কারণে এর সওয়াব কয়েকগুণ বেড়ে যাবে ইন শা আল্লাহ। এইজন্য তালিবুল ইলম নিয়তকে বারবার বিশুদ্ধ করে নিবে। ফলে সওয়াব তো হবেই সেই সাথে নিজের মাঝে উদ্দীপ্ত মনোভাবও আসবে। তালিবুল ইলম নিজের ও উম্মাহর নিকট থেকে অজ্ঞতা দূর করার নিয়ত করবে। আর এটি সম্ভব হবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে ইলম শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে, যেন তার ইলম দ্বারা সে লোকজনের উপকার করতে করতে পারে।

ইয়াহইয়া বিন আবু কাসির (রহঃ) বলেন, "তোমরা নিয়ত করতে শেখো। কারণ, নিয়ত আমলের চেয়ে অগ্রবর্তী।' (হিলইয়াতুল আওলিয়া: ৩/৭০)

এইজন্য নিয়তকে সবসময় শিখতে হবে, বিশুদ্ধ নিয়ত নিয়মিত চর্চা করতে হবে। নিয়ম এমন একটি বিষয় যা সবসময় প্রাক্টিসে রাখতে হয়।

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) বলেছেন,

العلم لا يعدله شيئ لمن صحت نيته

যে ব্যক্তির নিয়ত বিশুদ্ধ, সে ব্যক্তির ইলমের সমপরিমাণ কোন কিছুই হতে পারে না।

৩. তাকওয়া: ইলমের মূল হলো আল্লাহ ভীতি এবং ইলমের অবস্থান হলো কলবে। তাই কলবকে পবিত্র রাখতে হবে। মন, চোখ, কান, মুখ এগুলো হলো কলবের প্রবেশ পথ। এজন্য এই প্রবেশপথগুলোকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা প্রয়োজন। শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর ভয় ও কলবের পবিত্রতাকে তাকওয়া বলে। ব্যক্তি যখন নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে এবং বেশি বেশি নেক আমল করবে তখন সে ইলমের দিকে ধাবিত হতে পারবে। যতো গুনাহ করা হবে ততো ইলম কমতে থাকবে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُور

বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই আল্লাহকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল। (সূরাঃ ৩৫/ ফাতির, আয়াতঃ ২৮)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র:) বলেছেন, "বিপুল সংখ্যক হাদীস জানা জ্ঞানের পরিচায়ক নয় বরং বেশী পরিমাণ আল্লাহভীতিই জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,
يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّكُمۡ فُرۡقَانٗا وَيُكَفِّرۡ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ
ওহে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের দোষ-ক্রুটি দূর করে দিবেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন, আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। (সূরা ৮/ আল-আনফাল, আয়াতঃ ২৯)

৪. সবর: ইলম অর্জন করার জন্য সবর ও ধারাবাহিক মেহনত প্রয়োজন। আল্লামা যুরনূজী (রহঃ) বলেন, যদি খুবই মেহনত হলো কিন্তু উচ্চ মনোবল না থাকে তখনো বেশি ইলম অর্জন করা যাবে না। সাহস তো আছে তবে যদি মেহনত না থাকে তখনো ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়। কোনো কিতাবকে যখন মেহনতের পর বুঝে না আসে তখন জটিল মনে করে নিরাশ হওয়া যাবে না। ইবনুল কাইয়ুম (রহঃ) বলেন, আমি ছাত্রদের ওপর আর্শ্চযান্বিত, তারা তো নিজেরাই অবলোকন করছে যে, প্রত্যেক মূল্যবান বস্তু অর্জন করার জন্য উচ্চ মনোবল চেষ্টা-কোশিশের প্রয়োজন। কিন্তু ইলম সম্পর্কে তারা মনে করে তা এমনে এমনি অর্জিত হয়ে যাবে। এটি কী করে সম্ভব? যেহেতু ইলম হলো পৃথিবীর সকল বস্তুর চেয়ে বেশি মূল্যবান। ধারাবাহিক মেহনত ও নিয়মিত তাকরারের মাধ্যমে ইলম অর্জনের সাথে লেগে থাকতে হবে। আরাম ও বিলাসিতা পরিত্যাগ করলে তবেই ইলম অর্জিত হয়। ইবনে কসীর (রহঃ) বলেন, শরীরের আরামের সাথে ইলম অর্জন করা কখনো সম্ভব নয়। অন্যদিকে উস্তাদ কখনো তালিবুল ইলমের কল্যাণে কঠোর হলে তালিবুল ইলমকে সবরের সাথে তা কোমলভাবে নিতে হবে।

৫. উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ: উস্তাদের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের থেকে অনেক বেশি নিতে হবে। তাদের আখলাক, মুআমালাত, জীবন যাপন থেকে অনেক কিছু শিখতে হবে।
ইমাম মালেক রাহ বলেন,

كَانَ الرّجُلُ يَخْتلِفُ إِلَى الرّجُلِ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً يَتَعَلّمُ مِنْه
শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮)

৬. কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা: মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত গোটা জিন্দেগি কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী চলাই মূলত ঈমান। কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণ না করলে পার্থিব জীবন হবে সংকটময়। অপরদিকে আখেরাতে ভোগ করতে হবে কঠিন শাস্তি। তাই প্রতিটি কাজে ও পোশাক-আশাকে সুন্নতের অনুসরণ করা। লেবাসুস সালিহীন পরিধান করা। একেকটা সুন্নত জানা ও সাথে সাথে তার ওপর আমল করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
অর্থ: বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (সূরাঃ ৩/ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ৩১)

প্রিয় নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।" (বুখারী)

৭. ইলম অনুযায়ী আমল: আমল হলো ইলমের ফলাফল। ইলম আমলের দিকে হাতছানি দিয়ে ডাকে যে আমাকে আমল করো। খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন, *'তুমি যতক্ষণ ইলম থেকে বিমুখ থাকবে, ততক্ষণ তুমি আমল করে তৃপ্তি পাবে না। অনুরূপভাবে তুমি যদি আমলে শীথিলতা প্রদর্শন কর, তবে তুমি ইলম অর্জন করে তৃপ্তি পাবে না। সুতরাং তুমি উভয়ের মাঝে সমন্বয় কর। যদিও ইলম-আমল উভয়ের মাঝে তোমার সামান্য কিছু অংশ থাকে'। (খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমল, মুহাক্কিক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৮৪খৃ.), পৃঃ ১৪)*

৮. গুনাহ থেকে বিরত থাকা: ইলমের জন্য অনেক জরুরি বিষয় হল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। *ইমাম শাফেঈ (রহঃ) চিন্তা করলেন যে ইমাম মালেক (রহঃ) এর কাছ থেকে*

"আল মুয়াত্তা' শুনবেন। মুয়াত্তার ইলম তিনি হাসিল করবেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রথমে মক্কায় ছিলেন। তিনি (রহঃ) মক্কার গভর্নর থেকে চিঠি নিলেন যেন তিনি মদিনার গভর্নরকে বলেন, তিনি যেন ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর জন্য সুপারিশ করেন ইমাম মালেক (রহঃ) এর কাছে গিয়ে। তো তিনি মক্কার গভর্নরের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এলেন মদিনা গভর্নরের কাছে। গিয়ে চিঠি পেশ করলেন। মদিনা গভর্নর দেখলেন যে এই তালিবুল ইলম ইলমের জন্য কি পরিমান আগ্রহ নিয়ে এসেছেন। মদিনার গভর্নর স্বয়ং তাকে ইমাম মালেক (রহঃ) এর কাছে নিয়ে গেলেন। তো ইমাম মালেকের (রহঃ) সাথে প্রথম দেখা। এ দেখা হওয়ার পরে এক পর্যায়ে ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন যে, তোমার মাঝে আমি একটা নূর দেখছি। তোমার মধ্যে মেধা আছে, যোগ্যতা আছে। তো তুমি তোমার এই নূরকে গুনাহের মাধ্যমে নিভিয়ে দিও না। তালিবুল ইলম যদি গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে ইলমের বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যাবে।

৯. সময়ের সদ্ব্যবহার: ইলমের জন্য সময়কে হেফাজত করতে হবে। তালিবুল ইলমের নিজস্ব রুটিন থাকতে হবে তাহলে সময় যেকোনো জায়গায় নষ্ট হবে না। যে রুটিনবদ্ধ জীবন-যাপন করতে শিখেনি সে তরক্কি করতে পারবে না। এজন্য সময়ের হেফাজত অনেক জরুরি জিনিস।

সালফে-সালেহীনদের মধ্যে কারো ক্বওল আছে, *"হে বনী আদম, তুমি মানে কতগুলো দিন অর্থাৎ তুমিতো কতগুলো দিনের সমষ্টি। তোমার জীবন থেকে একটা দিন চলে গেল যেন তোমারই একটা অংশ চলে গেল। যেমন: তোমার যদি একটা চোখ চলে যায়, তোমার যদি একটা কান চলে যায়, তোমার যদি একটা পা চলে যায়, যেমন তুমি কষ্ট পাবে, তুমি মনে করবে তুমি অনেক কিছু হারিয়েছ। তোমার জীবনের সময়গুলো তো এর চাইতেও মূল্যবান। এগুলো যদি তুমি হারিয়ে ফেলো তাহলে যেন তুমি তোমাকেই নষ্ট করে দিলে"*। এজন্য সময়ের হেফাজত করা জরুরি বিষয়।

১০. বারবার পড়া: ইলম তলব করা তাসবিহ সমতুল্য। বিশিষ্ট সাহাবী মুআয (রঃ) বলেছেন, *তোমরা ইলম শিখো। কেননা:*

-আল্লাহর জন্য তা শিক্ষা করা তাকওয়ার মাধ্যম।

-ইলম চর্চা করা তাসবীহ সমতুল্য।

-ইলম অন্বেষণ করা এক প্রকারের জিহাদ।

-ইলম একাকিত্বের সঙ্গী।

-অজ্ঞ ব্যক্তিকে ইলম শিক্ষা দেওয়া সাদাকাহ।

-ইলম তলব করা ইবাদত।

-আহলে ইলমের কাছে ইলম পৌঁছানো নেকির কাজ।

(মুখতাসার মিনহাজুল কাসিদীন: ১৮)

তালিবুল ইলম দিনের নির্দিষ্ট একটি সময়ে তার পড়া বারবার পড়তে থাকবে যাতে করে তিনি যা মুখস্ত করেছেন তা ভুলে না যান এবং স্মৃতি আরও দৃঢ় হয়।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) তালিবুল ইলমদের মজলিসে বলতেন, *তোমরা লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে যিকিরে লেগে যেয়ো না। মীযান-মুনশাইবের গর্দানই তোমাদের যিকির। তোমরা সরফের গর্দান দিতে থাকবে, ইলমের পেছনে মেহনত করতে থাকবে। এটাই তোমাদের জন্য অনেক অনেক উত্তম যিকির। একজন মেহনতী তালিবুল ইলমের আমলনামায় দেখা যাবে অনেক যিকিরের নেকী।*

একজন তালিবুল ইলমের অভ্যন্তরীণ আদবের সাথে ব্যক্তিকেন্দ্রিকও কিছু আদব রয়েছে। তালিবুল ইলমের পুরো জীবনে সাথে জড়িয়ে আছে তার উস্তাদ, সহপাঠী, মা-বাবা এবং স্বামী-স্ত্রী। তাই তাদের সাথেও আচরণের মাধ্যমে আদব বজায় রাখা আবশ্যক।

১. তালিবুল ইলম পিতা-মাতার সাথে যেমন আচরণ করবে: মাঝেমধ্যে ইসলামী জ্ঞানের এমন কিছু ছাত্র দেখতে পাওয়া যায় যারা তাদের জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আলেমদের সংস্পর্শে থেকে অতিবাহিত করে। তারা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সাথে আলেমদের কথা শোনে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা নিজ পিতামাতার সাথে একজন রুক্ষ ও কঠোর স্বভাবের মানুষ হিসেবে আচরণ করে। তার পিতামাতা তাকে কিছু করতে বললে তখন সে উচ্চস্বরে অসন্তুষ্টির কথা জানান দেয় এবং নিজেকে অতি ব্যস্ত বলে জাহির করে। কী তাকে ব্যস্ত রেখেছে? ধর্মীয় বই পাঠ! জ্ঞান অর্জন! আলেমদের সাথে উঠাবসা এবং আরও অনেক ভালো কাজের সাথে যুক্ত আছে, এগুলো অবশ্যই ভাল কাজ। কিন্তু কখনোই উচিত নয় পিতামাতার সাথে রুক্ষ ও কঠোর স্বভাবের আচরণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা পিতামাতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ করেছেন এমনকি যদি তারা মুশরিকও হয়ে থাকে এবং এমন অবস্থায়ও

যখন তারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করতে বলে এবং মুর্তিপূজার দিকে আহবান জানায়! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন, *আর যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শিরক করতে জোর চেষ্টা করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়ায় তাদের সাথে বসবাস করবে সদ্ভাবে। (সূরাঃ ৩১/ লুকমান, আয়াত: ১৫)*

পিতা-মাতা শিরক করলেও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। ইব্রাহিম (আঃ) এর পিতা ছিল একজন মুশরিক। ইব্রাহিম (আঃ) তার পিতাকে দরদের সাথে ডাকতেন "ইয়া আবাতী" অর্থাৎ হে আব্বাজান। তিনি তার পিতাকে ইয়া আবি অর্থাৎ "আব্বা' বলে ডাকেননি। একজন মুশরিক পিতা হওয়ার সত্ত্বেও ইব্রাহিম (আঃ) তার সাথে আদব বজায় রেখে কথা বলতেন। যার দ্বারা তার পিতার প্রতি তার গভীর ভালোবাসা, সম্মান প্রকাশ পায়। তাহলে মুসলিম পিতামাতা আরও অনেক বেশী সম্মান পাবার অধিকার রাখে এমনকি তারা যদি বড় গুনাহগার মুসলিমও হয়ে থাকে। পিতামাতাকে অমান্য করে, তাদের সাথে রুঢ় আচরন করে এবং নিজ আচরনের দ্বারা পিতা-মাতার চোখে পানি নিয়ে এসে কেউ নিজেকে ইসলামী জ্ঞানের ছাত্র কিংবা ধার্মিক ব্যক্তি দাবী করতে পারে না। একজন জ্ঞান অন্বেষণকারীর ক্ষেত্রে এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, পিতামাতার অধিকার খর্ব করে দেয় এমন কোন ফতোয়া শুনে সে উৎফুল্ল হয়ে উঠে। কিছু মানুষ বাড়ি থেকে দূরে এবং পিতামাতার নাগালের বাইরে বন্ধুমহলে সে একজন ভদ্র ও সদাচারি ব্যাক্তি। সদা হাস্যোজ্জ্বল ব্যাক্তি হিসেবে সে তার দ্বীনি ভাই এবং সহপাঠীদের সাহায্য করে যায়। কিন্তু বাড়িতে আসামাত্রই সে রুক্ষ এবং কর্তৃত্বশীল হয়ে সবার মতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে এবং সে আশা করে যে সকলে তার মত গ্রহন করে নিবে। অথচ তার পরিবারে তার কোনো উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা নেই। সে না পারে অর্জিত জ্ঞান কে পরিবারের সদস্যদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আর না পারে পারিবারিক পরিমন্ডলে বিদ্যমান সকল নীতিবর্জিত কাজের বিরুদ্ধে তাদের সতর্ক করতে। তার পরিবারের সদস্যদের উপকারে আসতে পারে এমন ইসলামিক বই, ক্যাসেট বা ম্যাগাজিন সরবরাহের কোন উদ্যোগ নিতেও সে ব্যর্থ হয়। পূর্বের খারাপ আচরনের ফলস্বরূপ সে তাদের কোন উপকারেই আসতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সদস্যগন তার কথা শুনবে না কারন ইতোমধ্যেই তার এবং তার পরিবারের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝেমধ্যে এই ধরনের কোন ছাত্র সাহাবীগনের উদাহরন টেনে তার আচরণকে ঠিক প্রমান করতে চায়। সে

উদাহরন দেয় সেসমস্ত সাহাবীগনের যারা দ্বীনের খাতিরে তাদের পিতামাতার বিরুদ্ধে গিয়েছিল। তারা উল্লেখ করে উবাইদা ইবনুল জাররাহ এর কথা যে তার পিতাকে হত্যা করেছিল। কিন্তু সে উল্লেখ করতে ভুলে যায় যে সেসমস্ত লোকেরা শুধুমাত্র কাফেরই ছিলনা বরং তৎকালীন মুসলমানদের নির্মম নির্যাতন করছিল। হতে পারে এই ছাত্রের পিতা-মাতা গুনাহগার মুসলিম। এমনকি তারা ভাল মুসলিমও হতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র এই স্বল্পবয়সী তরুন তার যৌবনের তেজ, ব্যাক্তিত্ব ইত্যাদি কারণে তার পিতামাতার সাথে মন্দ আচরণ করে। ফলস্বরূপ পিতামাতাও তার সাথে দ্বিমত পোষণ করে যা তাকে তার পিতা-মাতার সম্বন্ধে আরো খারাপ ধারণা করতে সাহায্য করে। এটা অবশ্যই জ্ঞানের পথে এক ভয়াবহ চোরাফাঁদ। আমাদের সমাজে এমন কিছু মানুষ আছে যারা শরীয়তের বিধি বিধান থেকে দূরে থাকলেও বাবা মায়ের সাথে সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো। যার জন্য মায়ের দুআ ও বরকতে তারা জীবনে অনেক সফলতা লাভ করতে পারে। আবার কিছু মানুষ আছে যারা শরীয়তের বিধি বিধান সম্পর্কে অবগত, অনেক পরিশ্রম করেন দ্বীনি ইলম অন্বেষণের জন্য কিন্তু পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ভালো না। এই কারণে তারা ইলম থেকে মাহরুম হয়ে যায়। একজন তালিবুল ইলমকে পিতা-মাতার সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা তার দ্বীনের জ্ঞান অন্বেষণ করা এবং অর্জন করার জন্য পিতা-মাতার দুআ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার ছাড়া একজন তালিবুল ইলমের ইলম কোনো কাজেই আসবে না। ইলম অর্জনের জন্য পিতা-মাতার দুআ অত্যন্ত কার্যকরী। একজন তালিবুল ইলম যদি পরিশ্রম করে ৫০% ইলম অর্জন করতে পারে, তবে পিতা-মাতার দুআর কারণে তা ১০০% হয়ে যেতে পারে। পিতা-মাতার সাথে আদবের একটি নমুনা হলো পিতা-মাতার সাথে খেতে বসলে সবচেয়ে বড় অংশটা তাদের তুলে দিতে হয়। অনেক সময় বাবা-মা বড় অংশটি নিতে রাজি হয় না। তারা চায় তাদের সন্তানই ভালোটা যেন খায়। এক্ষেত্রে সন্তানের আচরণ দুই রকম হয়ে থাকে। কেউ বলতে পারে, "আরে, খাও তো!" আবার এভাবেও বলা যায়, "আপনি এই অংশটা খেলেই আমার বেশি ভালো লাগবে।" আমাদের আচরণের দ্বারা পিতা-মাতার অনুভূতি যা হবে; সেটাই হবে আমাদের প্রতি তাদের সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির কারণ। একজন তালিবুল ইলমকে এই সূক্ষ্ম বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় পিতা-মাতা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে না। ফলে তারা পরিবারে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তন বা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যার ফলে তারা

পরিবারে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে পারে না। তাই একজন তালিবুল ইলম তার পিতা-মাতার সাথে সর্বাবস্থায় সদাচরণ করবে, নম্র ও বিনয়ী হবে। পিতা-মাতার সন্তুষ্টি নিয়ে দ্বীনের পথে চলবে। এটাই একজন তালিবুল ইলমের কর্তব্য।

২. তালিবুল ইলম স্বামী/স্ত্রীর সাথে যেমন আচরণ করবে: পিতা-মাতার পর সবচেয়ে কাছের ব্যক্তি হচ্ছে স্বামী/স্ত্রী। এরপরেও তালিবুল ইলমদের স্ত্রীকে অভিযোগ করতে শোনা যায় যে, সে কখনোই তার জীবনসঙ্গীনির সাথে অর্জিত জ্ঞান ভাগাভাগি করে নেয় না ফলে তার স্বামীর জ্ঞান স্ত্রীর কোন কাজে আসছে না। এতে করে ছাত্রটির স্ত্রী ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞই থেকে যায়। ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে অবগত না থাকার কারণে তার স্ত্রী উগ্র পোষাক পরিধান, বেপর্দা হয়ে ঘুরে বেড়ানো কিংবা গানবাজনা শোনার মত নিষিদ্ধ কাজেও লিপ্ত হয়ে থাকে। বাস্তবতা হল এসমস্ত ছাত্ররা তাদের স্ত্রীর উপর খবরদারি করা ছাড়া চলতেই পারেনা। তারা শুধু খবরদারি করবে, কি করা উচিত, কি না করা উচিত এসব নিয়ে শাসাতে থাকবে, বিদ্রুপাত্মক স্বরে কথা বলবে। এমনকি স্ত্রীদের তারা মারধর করতেও দ্বিধাবোধ করেনা এবং এমন মনে করে যে, এটাই হচ্ছে শাসনের সঠিক উপায়। জ্ঞানের এই ছাত্রটি কখনও তার স্ত্রীর সাথে বসেওনি আল্লাহ ও তার রাসুল কি বলেছেন তা জানাতে। স্ত্রীর অন্তরকে শান্ত করার জন্যে কখনও সে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়নি। ইসলামে কী বৈধ আর কী অবৈধ তা সে কখনও বলেনি। সে তার সাথে ভালো ব্যবহার করে না। ধর্মীয় জ্ঞানের একজন ছাত্র তার বন্ধুবান্ধবদের সাথে সহানুভূতিশীল অথচ তার পিতামাতা, ভাইবোন এবং স্ত্রীর সাথে কঠোর এবং রুক্ষ, এটা এমন এক অসামঞ্জস্যতা যা কোনভাবেই সহনীয় বা যুক্তিযুক্ত নয়। একইভাবে বিপরীতটাও অনুচিত। একজন স্ত্রী তার অর্জিত ইলম দ্বারা যদি স্বামীর আনুগত্য না হয়, স্বামীর সাথে সদাচরণ করা, এবং তাকে সম্মান দিতে না পারে তবে সেই ইলম অর্থহীন। হয়ত কোনো পুরুষের স্ত্রী ইলম তলব করলেও তার স্বামীকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে না, তার হক আদায় করছে না, তাহলে সেটাও ঠিক করছে না। বরং এটা আরও কঠিন চিন্তার বিষয় যে নিজে দ্বীনের পথে থাকলেও অন্যের জন্য চিন্তা-ফিকির নেই। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে নিজেদের আখলাক, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও মেহনতের মাধ্যমে দ্বীনের পথে নিয়ে আসবে। এটাই প্রকৃত জ্ঞানীর আচরণ। ভালোবাসা দিয়ে মানুষকে বদলে দেওয়া যায়। ফিরাউন-আসিয়ার উদাহরণ যেমন রয়েছে, তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশা (রঃ), যয়নাব (রঃ) আবুল আসের উদাহরণও আছে। তালিবুল ইলমের দায়িত্ব হচ্ছে স্বামী/স্ত্রীকে ভালোবাসা ও হেকমতের সাথে দাওয়াত দেয়া।

৩. তালিবুল ইলম তার সহপাঠীদের সাথে যেমন আচরণ করবে: কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনার পরে যদি কোনো সহপাঠী সেই বিষয়টা না বুঝতে পারে এবং এর জন্য উস্তাদের নিকট বারবার প্রশ্ন করে, তবে তার প্রতি অন্য সহপাঠীরা বিরক্ত হওয়া যাবে না। কেউ কেউ আগে আগে বুঝে যায়, আর কেউ কেউ সহজে বুঝতে পারে না। এক্ষেত্রে সে যদি তার অন্য সহপাঠীদের জিজ্ঞেস করে এবং সে বিষয়টা বোঝার পরও না বুঝাতে চায় বা বিরক্তি প্রকাশ করে তবে তা তার জন্য ইলম থেকে মাহরুমের কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে সহপাঠীদের বারবার প্রশ্নের দ্বারা নিজে উপকৃত হচ্ছি মনে করাটাই কর্তব্য। সহপাঠীদের সাথে অহংকার না করা বরং আগ বাড়িয়ে সহপাঠীদের সাহায্য করা, কোনো বিষয়ে না বুঝলে আলোচনা করে নেয়া হলো সবচেয়ে ইহসানের বিষয়। সহপাঠীদের সাথে হাসি মুখে কথা বলা, বিনয়ের সাথে তাদের সমস্যার সমাধান করা, তাদের যারা কম বুঝে তাদের ধৈর্য সহকারে বুঝানোর চেষ্টা করা, নিজে ভালো করে নোট করে থাকলে সেটা দিয়ে সাহায্য করা। অনেকে মাদ্রাসার সহপাঠীদের সাথে আদব বজায় রেখে চললেও অন্য স্থানে বা মাদ্রাসার বাহিরে প্রাতিষ্ঠানিক সহপাঠীদের সাথে দ্বীনবিমুখ হয়ে যাওয়া, আদববিহীন মেলামেশা ও আচরণ করা ঠিক নয়। যেমন: কেউ যদি এমন হয় যে সে দ্বীনি সার্কেলে থাকলে সিগারেট সেবন করে না, হারাম কোনো কাজ করে না কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সহপাঠীদের সাথে বা অফিসের সহকর্মীদের সাথে থাকলে সিগারেট সেবন করে, হারামে জড়িয়ে পড়ে। দ্বীনি সার্কেলে অশ্লীল কথা বলে না কিন্তু অন্যদের সাথে বলে তবে এই কারণেও সে ইলম থেকে মাহরুম হয়ে যেতে পারে। তাই দ্বীনি সার্কেলে যে আদব থাকবে, অন্যান্য ফ্রেন্ড সার্কেল বা সহকর্মীদের সাথেও তদ্রূপ আদব বজায় রাখতে হবে। বরং সর্বাবস্থায় আদব হবে শরীয়াহ এর উপর। বে-দ্বীনি সার্কেলে থাকলেও
দাওয়াতের কাজ করতে হবে। যেমনঃ সালাম দেয়া, বিনয়ের সাথে নামাজের দাওয়াত দেয়া, কথা/আড্ডার ফাঁকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া, শরীয়ত নিষিদ্ধ কোন কথা/কাজ হলে তাতে বাধা দেওয়া ইত্যাদি।

৪. তালিবুল ইলম তার উস্তাদের সাথে যেমন আচরণ করবে: উস্তাদগনের প্রতি সম্মান তালিবুল ইলমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উস্তাদরা হচ্ছেন এই যাত্রায় তালিবুলইলমের পথ প্রদর্শক। উস্তাদের দুআর মাধ্যমে ইলম লাভের পথ সহজ হয়ে যায়, ইলমের দুয়ার খুলে যায়। প্রাথমিক স্তরের ইলম কিতাবের বুক থেকে গ্রহণ করা যায় না। বরঞ্চ অবশ্যই একজন যোগ্য শাইখ থেকে নিতে হয় যার মৌলিক জ্ঞানগুলো রপ্ত আছে; যাতে করে স্খলন থেকে নিরাপদ থাকা যায়। সর্বদা উস্তাদের সাথে আদব বজায় রাখা হলো ইলম অর্জনের অন্যতম চাবিকাঠি। কম মেধা থাকা সত্ত্বেও উস্তাদের খেদমতের দ্বারা অনেক তালিবুল ইলমকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এমন অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন যা অনেক প্রজ্ঞা সম্পন্ন মানুষও করতে পারেননি। উস্তাদের প্রতি সম্মান, শ্রদ্ধা, আনুগত্য, নম্রতা এগুলো তালিবুল ইলমের মাঝে থাকতে হবে। উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিতে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। শাইখের সাথে যাবতীয় আদব রক্ষা করে চলবে। উস্তাদের সাথে বসার ক্ষেত্রে, কথা বলার ক্ষেত্রে, প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে, শ্রবণ করার ক্ষেত্রে, তার সামনে কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টানোর ক্ষেত্রে, তার সামনে উচ্চবাচ্য পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে, কোন কথা বা হাঁটার মাধ্যমে তাঁর অগ্রবর্তী না হওয়া, তার সামনে অধিক কথা না বলা, নিজের কথা দিয়ে তার দরসের মধ্যে সংযোজনী না দেয়া, কোন জবাব দেয়ার জন্য চাপাচাপি না করা, অধিক প্রশ্ন না করা বিশেষত অনেক মানুষের উপস্থিতিতে। কেননা এটি প্রবঞ্চিত করবে, বিরক্তির উদ্রেক করবে। উস্তাদকে ডাকা ও নাম লিখার ক্ষেত্রেও সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। যেমন: সরাসরি নামে ডাকা যাবে না। এভাবে বলবে, ইয়া শাইখি (হে আমার শাইখ), ইয়া শাইখানা (হে আমাদের শাইখ)। নামের পর- "হাফিযাহুল্লাহ", "দামাত বারাকাতুহুম" ইত্যাদি দুআ করা। তাফসীরের উস্তাদ, হাদিসের ওমুক উস্তাদ ইত্যাদি এমনভাবে ডাকা। এক গুরুত্বপূর্ণ আদব এটাও যে, কোনো মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে কিংবা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে উস্তাদের কোনো ভুল হয়ে গেলে (যা হওয়া খুবই সম্ভব) আর তালিবুল ইলমের এ সম্পর্কে অবগতি থাকলে দরস বা আম মজমায় উস্তাদের নিকট তা পেশ করা যাবে না; বরং নির্জনে গিয়ে পূর্ণ আদব বজায় রেখে উস্তাদের নিকট তা ব্যক্ত করতে হবে। পরামর্শ প্রার্থনা বা মতামত প্রকাশের পদ্ধতিতে তাকে জানাতে হবে। এই সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো:-

ইমাম আবু বকর ইবনুল আনবারী প্রতি জুমাবারে তাঁর মজলিস হত। কোনো মজলিসে একটি হাদীস ইমলা করানোর সময় সনদের এক রাবীর নামে ভুল করে ফেলেন।

(‘হিববান’কে ‘হাইয়ান’ বলেছেন বা এ জাতীয় কোনো ভুল।) দারাকুতনী (রহঃ) সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি চিন্তা করলাম, তিনি এত বড় মানুষ, তাঁর সূত্রে লোকেরা এই ওহাম লিখে নিবে, এটা কেমন কথা? কিন্তু তাঁকে এই ভরা মজলিসে কী করে বলি? দারাকুতনী বলেন, মজলিস শেষ হলে আমি তাঁর মুসতামলীকে বললাম যে, অমুক নামের ব্যাপারে শাইখের ওহাম হয়ে গিয়েছে। সঠিক হল এই। দারাকুতনী বলেন, পরবর্তী জুমায় আমি মজলিসে উপস্থিত হলে শুরুতেই ইবনুল আনবারী (রহঃ) মুসতামলীকে বললেন, লোকদেরকে বলে দাও যে, গত জুমায় অমুক হাদীস ইমলা করার সময় সনদের অমুক নাম উচ্চারণে আমি ভুল করে ফেলেছি। সঠিক নাম এই। আর এ কথাও বল যে, ওই নওজোয়ান (দারাকুতনীর দিকে ইঙ্গিত করে) আমাকে তা সংশোধন করে দিয়েছিল।

তালিবুল ইলম অনলাইনে পড়াশোনার ক্ষেত্রেও সর্বদা আদব বজায় রাখবে। এক্ষেত্রে আদব হলো বারবার চ্যাটবক্সে প্রশ্ন না করা কিংবা উত্তরের আশায় একই প্রশ্ন বারবার পোষ্ট না করা। উস্তাদকে দরসের পর মেসেজ/মেইল দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি নিয়ে বলা। তালিবুল ইলমের কাছে যদি উস্তাদের কোনো ভুল চোখে পড়ে কিংবা কোনো বিস্মৃতি ধরা পড়ে তাহলে এটার কারণে তালিবুল ইলমের চোখে যেন উস্তাদের মর্যাদা খাটো হয়ে না যায়। কেননা এটি তালিবুল ইলমের ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। ভুল থেকে বাঁচতে পারেন এমন কেউ কি আছে।

ইলমের উপকরণের আদব

ইলম অর্জনের জন্য ইলমের উপকরণের আদব রক্ষা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উপকরণের মাধ্যমে তালিবুল ইলম ইলম অর্জন করে। আদব না থাকলে ইলমের নূর পাওয়া যায় না। কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস পড়া বুঝার জন্য নাহু, সরফ, আদব সহ অনেক কিতাব আছে। এ সকল কিতাবের মধ্যে যা কিছু লিখা হয়েছে সব কিছুর উদ্দেশ্য হলো কুরআনুল কারীম পর্যন্ত যাওয়া। ইলম পুরোটাই কুরআনের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো ইলম অর্জনের কিতাব। এরপর কিতাব, কাগজ, কলম, কালি, সিলেট, পেন্সিল ইত্যাদি এগুলো ইলম অর্জনের উপকরণ। অতএব কিতাব সহ ইলম অর্জনের যাবতীয় উপকরণের আদব রক্ষা করতে হবে। এগুলোর

আদব রক্ষা না করলে অনেক পরিশ্রম করলেও ইলমের নূর আসবে না। আদব যতো বেশি থাকবে ইলমের নূর ততো বেশী আসবে। তাই ক্লাসে কিতাবাদী নিয়ে ইলম অর্জনের জন্য বসলে তখন আদবের সাথে বসতে হবে। ক্লাসে বসার, কিতাবাদী পড়ার, যার মাধ্যমে ইলম অর্জন করবে সে মাধ্যমগুলোর কিছু আদব আছে। ক্লাসে বসার সময় অবশ্যই ওজু করে এবং খুব মনোযোগের সাথে বসতে হবে। কিতাবের মর্যাদা অনুযায়ী টেবিলে কিতাব সাজাতে হবে। যেমন: আল কুরআন সর্বশ্রেষ্ট কিতাব। এটির মর্যাদা সবচেয়ে বেশী। এটির উপর কিছু রাখা যাবে না। এটির নিচে অন্যান্য কিতাব মর্যাদা অনুযায়ী রাখতে হবে। এটি কিতারের আদব। শুয়ে, খেতে-খেতে, কোনো কাজ করা অবস্থায় ক্লাস করা উচিত নয়। এতে ক্লাসের রুহানিয়ত পাওয়া যায় না। ইলমের প্রতিষ্ঠান, উস্তাদদের প্রতি ওনাদের সামনে-আড়ালে আন্তরিকতা, সম্মান, আদব বজায়ে রাখতে হবে। সুতরাং প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য মুহাব্বত ও আন্তরিকতার সাথে বজায় রাখতে হবে। বাবা-মা, বড়দের থেকে আদব বিনয়ের মাধ্যমে দোয়া নিতে হবে। সবসময় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। ইলমের সাথে সম্পর্কিত সামগ্রীর সাথে আদবের খেলাফ হয় এমন কাজ করা যাবে না।

ইলম থেকে মাহরুমীর কারণ

ইলম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নেয়ামত সমূহের মধ্যে এমন এক অন্যতম নেয়ামত যা কেবল সৌভাগ্যবানদের নসীবেই জোড়ে। ইলমে দ্বীনের এই অবক্ষয়ের যুগে যখন সকল মানুষ দুনিয়ার পিছনে ছুটে চলেছে তখন গুটি কয়েক মানুষ আখেরাত লাভের উদ্দেশ্যে ইলম হাসিলের পথে অগ্রসর হয়। এটা অনেক বড় কুরবানি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে লক্ষ করা যায়, বাহু তালিবুল ইলম ইলমের এই নিয়ামত পেয়ে তার জন্য নানা রকম কুরবানি করেও দৃশ্যমান বা কখনো তো দৃশ্যমান কোনো কারণ ছাড়াই ইলমের মহামূল্যবান পথ থেকে মাহরুম হয়ে যাচ্ছে। এসব মাহরুমীর মূল কারণ হচ্ছে মাহরুমীর কারণ সমূহের ব্যাপারে সতর্ক না থেকে তাতে জড়িয়ে পড়া। ফলে মাহরুমী অনিবার্য হয়ে যায়। এজন্য তালিবুল ইলমকে ইলম থেকে মাহরুমীর দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান কারণগুলো অবশ্যই জানা প্রয়োজন এবং সেগুলো থেকে নিজেকে যথাসম্ভব

বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। এখানে ইলম থেকে মাহরুমীর কিছু কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

১. গুনাহ করা: ইলম হলো নূর। গুনাহ হলো অন্ধকার। গুনাহের কারণে মানুষের ইলমের নূর নিভে যায় এবং ইলমের বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর বিখ্যাত ঘটনা আছে। *তার স্মরণ শক্তি এমন ছিল যে কোনো একটা পৃষ্ঠা একবার দেখলে মুখস্থ হয়ে যেত। তো একবার তিনি খেয়াল করলেন যে তার স্মরণ শক্তিতে দুর্বলতা এসে গেছে। তো তার উস্তাদ ছিল ওয়াকি (রহঃ)। তার কাছে গিয়ে বললেন যে হযরত আমার স্মরণ শক্তি তো মনে হচ্ছে কমে আসছে। তো তিনি (রহঃ) তাকে ওসিয়ত করলেন গুনাহ ছেড়ে দিতে। এই ওসিয়তকে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) কবিতা বানিয়ে ফেলেছিলেন যাতে সারাজীবন মনে থাকে। আজ পর্যন্ত যত তালিবুল ইলম আসবে তারা যেন মনে রাখেন এজন্য কবিতা বানিয়ে ফেলেছেন। তিনি কবিতাতে লিখেছিলেন, "আমি ওয়াকি (রহঃ) এর কাছে এসে শেকায়েত করলাম যে আমার স্মরণ শক্তি কমে গেছে তো তিনি আমাকে ওসিয়ত করলেন গুনাহ ছেড়ে দিতে এবং এই কথা বললেন, ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে এক নূর; আল্লাহ তার নূর কোনো গুনাহগারকে দেন না।"*

ইলম অর্জনের জন্য মুখস্থ শক্তির দৃঢ়তা প্রয়োজন। গুনাহের কারণে মুখস্থ শক্তি দূর্বল হতে থাকে ফলে তালিবুল ইলম একসময় ইলমের পথ থেকে ঝরে পড়ে। খতীব আল-জামে নামক গ্রন্থে ইয়াইয়া বিন ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, *এক লোক মালেক বিন আনাসকে বললেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! মুখস্তশক্তি বাড়ানোর কোন কিছু আছে কি? তিনি বলেন: যদি কোন কিছু থাকে তাহলে সেটা হল: গুনাহ পরিত্যাগ করা। যখন কোন মানুষ গুনাহ করে তখন এ গুনাহটি তাকে ঘিরে রাখে এবং গুনাহর ফলে তাকে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা পেয়ে বসে। সে গুনাহর কারণে তার চিন্তাধারা মশগুল হয়ে থাকে। এভাবে এ দুশ্চিন্তা তার অনুভূতির উপর আধিপত্য বিস্তার করে থাকে এবং তাকে অনেক কল্যাণকর কাজ থেকে দূরে রাখে। এর মধ্যে মুখস্তশক্তি অন্যতম। (খতীব আল-বাগদাদীর আল-জামে/খণ্ড:২; পৃষ্ঠা: ৩৮৭)।*

গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাটা জরুরি। ইলমের জন্য অন্তরকে গুনাহ থেকে পবিত্র রাখতে হবে। এইজন্য নফসের সাথে মুজাহাদা করতে হবে।

২. দৃষ্টির হিফাযত না করা: কুদৃষ্টি খুবই মারাত্মক গুনাহ। দৃষ্টি হচ্ছে শয়তানের একটি বিষাক্ত তীর। বনী আদমকে শিকার করার জন্য শয়তানের সবচেয়ে সহজ অস্ত্র হলো এই তীর। অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি চালনার কুফল সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

النظرة سهم مسموم من سهام ابليس

"অনিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি ইবলীসের বিষাক্ত বাণ বিশেষ।" (মুসনাদ আশ-শিহাব ১মখন্ড ১৯৫-১৯৬ পৃষ্ঠা)

ইবনু মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *'দৃষ্টি শয়তানের বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে দৃষ্টির হেফাজত করবে, তৎপরিবর্তে আল্লাহ তাকে এমন ঈমান দান করবেন, যার মিষ্টতা সে অন্তরে অনুভব করবে।' (তাবরানি, হাদিস ১০৩৬২)*

চোখের অনৈতিক ব্যবহারে মন অশান্ত হয়। না পাওয়া আর আক্ষেপের অনলে দহন হতে হয়। ইবনুল কাইয়িম (রহ.) বলেছেন, *যে ব্যক্তি দৃষ্টিকে ছেড়ে দেয়, তার আফসোস ও মনোবেদনা স্থায়ী হয়। অন্তরের জন্য অধিক ক্ষতিকর হলো চোখকে ছেড়ে দেওয়া, উম্মুক্ত করে দেওয়া। কেননা, সে তাকে এমন জিনিস দেখায়, যা থেকে সে ধৈর্য ধারণ করতে পারে না এবং তা অর্জনও করতে পারে না। আর এটা বড়ই কষ্টদায়ক। (রওজাতুল মুহিব্বিন, পৃষ্ঠাঃ ১১৩)*

বর্তমানে সবদিকে চোখের খেয়ানতের উপকরণের ছড়াছড়ি। হারাম বস্তু থেকে চোখ সরতেই চায় না। পরনারী কিংবা পরপুরুষ দেখলে চোখ ফেরানোর বদলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মোবাইলের স্ক্রিন, পোস্টার, বিলবোর্ডে এমনকি খাবারের প্যাকেটেও ছড়িয়ে আছে চোখের পাপ। পরনারী কিংবা পরপুরুষ দেখলে চোখ সরতেই চায় না। আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *চোখের যিনা হলো দেখা। (সহীহ বুখারি, হাদিস ৬২৪৩)*

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী (রঃ) কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন,

يا علي! لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة

'হে আলী, একবার কোন পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি পড়লে পুনরায় তার প্রতি চোখ তুলে তাকাবে না। কেননা তোমার জন্যে প্রথম দৃষ্টিই ক্ষমার যোগ্য, দ্বিতীয়বার দেখা নয়।' (আবূ দাউদ ২১৪৯, হাসান, আলবানী)। এর কারণ সুস্পষ্ট। আকস্মিকভাবে প্রথমবার

যে চোখ কারো উপর পড়ে গেছে, তার মূলে ব্যক্তির ইচ্ছার বিশেষ কোন যোগ থাকে না; কিন্তু পুনর্বার তাকে দেখা ইচ্ছাক্রমেই হওয়া সম্ভব। এ জন্যেই প্রথমবারের দেখায় কোন দোষ হবে না; কিন্তু দ্বিতীয়বার তার দিকে চোখ তুলে তাকানো ক্ষমার অযোগ্য। বিশেষত এ জন্য যে, দ্বিতীয়বারের দৃষ্টির পিছনে মনের কলুষতা ও লালসা উত্তেজনা থাকাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের দৃষ্টি দিয়ে পরস্ত্রীকে দেখা স্পষ্ট হারাম। তার মানে কখনো এ নয় যে, পরস্ত্রীকে একবার বুঝি দেখা জায়েয এবং এখানে তার অনুমতি দেয়া হচ্ছে। আসলে পরস্ত্রীকে দেখা আদতেই জায়েয নয়। এজন্যেই কুরআন ও হাদীসে দৃষ্টি নত করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করা হল, *'পরস্ত্রীর প্রতি আকস্মিক দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে আপনার কী হুকুম? তিনি বললেনঃ اصرف بصرك "তোমার চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নাও।" (আবূ দাউদ হাদিস ২১৪৮, সহীহ আলবানী)।* অন্যদিকে একই বিধান নারীদের জন্যও। *রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নিকটে উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়েলোকদের জন্য ভাল কী?" প্রশ্ন শুনে সকলেই চুপ মেরে থাকলেন, কেউ কোন জবাব দিতে পারলেন না। আলী (রঃ) এখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বাড়ি এসে ফাতিমা (রঃ) কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই জবাব দিলেনঃ لا يراهن الرجال ভিন্ পুরুষরা তাদের দেখবে না। এটাই তাদের জন্যে ভাল ও কল্যাণকর)। অপর বর্ণনায় ফাতিমা বললেনঃ لا يرين الرجال ولا يرون هن মেয়েরা পুরুষদের দেখবে না, আর পুরুষরা দেখবে না মেয়েদেরকে। (দারকুতনী, বাযযার)*

কুদৃষ্টি যে গুনাহ এই অনুভূতিও অনেকের থাকে না। কিছু বুযুর্গের অভিমত হল, *"আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা যখন কাউকে তার দরবার থেকে বিতাড়িত করতে চান তখন তাকে সুদর্শন বালকের মহব্বতে লিপ্ত করে দেন"*। এই গুনাহ এতোটাই সুপ্ত হয়ে থাকে যে, নিজেকে দ্বীনদ্বার মনে করে এমন অনেকেই মনের অজান্তে এ গুনাহে লিপ্ত থাকেন, ফলে গুনাহের কারণে হিদায়াতের নূর নষ্ট হতে থাকে এবং একসময় সে দ্বীন থেকে ছিটকে পড়ে। দৃষ্টিই হলো অন্তরের চালিকা শক্তি। তাই তালিবুল ইলমকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং কেউ এতে লিপ্ত হয়ে পড়লে দ্রুত ইসলাহের ফিকির করতে হবে।

৩. হারাম পরিবেশ: বাড়ীতে আল্লাহর নাফরমানি হওয়া ইলম থেকে মাহরুমির কারণ। বাড়িতে গাইরে মাহরামের সাথে পর্দা করে না। টেলিভিশন, কম্পিউটার এবং

মোবাইলের স্ক্রিনে নাচগান চলতে থাকে। মা-বাবা, ভাই-বোন পর্দা করে না, সে বাড়িতে ইলম দাখেল হওয়ার স্বাভাবিক পথ নেই। এগুলোর উপর যদিও তালিবুল ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই, তবুও এগুলো তার ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার অনেক বড় কারণ। এটা থেকে বাঁচার উপায় হলো সে নিজেকে এসব থেকে বিরত রাখবে। কারন যাদেরকে দিয়ে আল্লাহ দ্বীনের হিফাযত করবেন, তারা নিজেরাই যদি দ্বীনকে বরবাদ করে তবে কিভাবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে উম্মতের পথ প্রদর্শক বানাবেন। সুতরাং তালিবুল ইলম চেষ্টা করেও যদি বাড়িতে পর্দা আনতে না পারে তাহলে অন্তত যাদের সঙ্গে পর্দা করা জরুরি তাদের সঙ্গে পর্দা করবে। বাড়িতে নাচগান, আরো সব অনাচার, গায়ে হলুদ, জন্মদিন পালন, নববর্ষ উদযাপন করা হয়। কিন্তু সে ইসলামবিরোধী বলে এগুলোর প্রতি অন্তরে ঘৃণা পোষণ করবে এবং এগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে। যে কামরায় টেলিভিশন, কম্পিউটার চলছে সেখান থেকে সে উঠে যাবে। এ বিষয়টা নিয়ে সে যে পেরেশান তা ভদ্র, সংযত ও কোমলভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দেবে। আল্লাহ চাইলে সে নিরাপদ থাকবে এবং মাহরুমি থেকে বেঁচে যাবে। মূল কথা, প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তালিবুল ইলম যদি হারাম খাদ্য থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে, পর্দার উপর পুরা মজবুতির সঙ্গে আমল করে এবং যাবতীয় অনাচার থেকে দূরে থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইলম দান করবেন। এধরনের আরো কিছু কারণ আছে, যেগুলোর উপর তালিবে ইলমের নিয়ন্ত্রণ নেই। কিন্তু সেগুলো থেকে বাঁচার উপায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা রেখেছেন। যেমন ইলম ও আহলে ইলমের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, তাদের সঙ্গে সদাচার, তাদের দোষচর্চা পরিহার।

৪. হারাম থেকে না বাঁচা: হালাল খাওয়া ও পরা দ্বীনের ইলম হাসিল হওয়ার জন্য একেবারে অপরিহার্য শর্ত। তালিবুল ইলমের খোঁজ রাখা উচিত যে, তার অভিভাবকের উপার্জন হালাল কিনা। তালিবুল ইলমের ভরণপোষণ যারা করে তাদের অনেকেই এমন গুরুতর বিষয়েও অনেক উদাসীন থাকেন। কোন কাজ হালাল আর কোন কাজ হারাম জানা নেই। অনেকে তো হারাম জেনে শুনেও সেই কাজে লিপ্ত হচ্ছে। তো কোন অভিভাবক যদি হারাম পথে উপার্জিত অর্থ তালিবুল
ইলমের পিছনে ব্যয় করে, আর তালিবুল ইলম তা ভোগ করে এবং তা দ্বারা তার শরীরের রক্তমাংস তৈরী হয় তাহলে চিরতরে ইলমের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। আর ইলম অর্জন যদি চলমান থাকেও তাহলে এ আশঙ্কা অবশ্যই রয়েছে যে, ঐ ইলম তার জন্য

এবং তার কাউমের জন্য ফিতনার কারণ হবে। তাই অভিভাবকের উপার্জন যদি হারাম হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে করণীয় হল যতটুকু গ্রহণ করলে কোনো রকম জানটা বাঁচে এ পরিমাণ গ্রহণ করবে আর ইস্তিগফার করবে এবং আল্লাহর কাছে দুআ করবে যে, হে আল্লাহ, আমার জন্য হালাল খাদ্যের ব্যবস্থা করে দাও। আমার ইলমের পথের এই বাধা এবং অন্য সমস্ত বাধা দূর করে দাও। আর যা উপায়হীন অবস্থায় গ্রহণ করছি, আমার জন্য তা হালাল করে দাও। বাবার জন্য দুআ করবে, হে আল্লাহ, তুমি তাকে হারাম উপার্জন থেকে উদ্ধার করো এবং হালাল উপার্জনের তাওফীক দান করো। এভাবে ভিতরে যদি তড়প ও অস্থিরতা আসে তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অন্তত তার জন্য ঐ খাদ্য হালাল করে দেবেন। আসল কথা হলো, হালাল-হারামের বিষয়ে দিলের তড়প ও অস্থিরতা।

তারপর মা-বাবাকে আদবের সঙ্গে বলবে, উস্তাদকে দিয়ে বলাৰে যে, সন্তানের ইলমের জন্য পিতা-মাতার হালাল-হারাম বেছে চলা খুব জরুরি। যে ঘরের উপার্জন হালাল নয় সে ঘরে ইলম আসে না, আসতে চায় না। সন্তানকে মাদরাসায় দিলেও তার যিন্দেগি কামিয়াব হয় না; না দুনিয়াতে, না আখেরাতে। তালিবুল ইলম শরীআতের পক্ষ হতে মুকাল্লাফ স্তরে পৌঁছে গেলে কোনো অজুহাতেই দায়মুক্ত হতে পারবে না। অভিভাবকের উপার্জন হারাম হলে তাকে যে কোনো উপায়ে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। থাকতেই হবে। অন্যদিকে দেখা যায় যে, অভিভাবকের উপার্জন হালাল হলেও কাছের আত্মীয়স্বজনদের উপার্জন হালাল নয়।

শরীআতের কঠিন বিধান ও কড়া হুকুম এই, যে বা যারা হারাম উপার্জন করে বলে জানা আছে, তালিবুল ইলম তাদের বাড়িতে বেড়াতে, কিছু খেতে পারে না। যেখানে হারামের গন্ধ আছে, তালিবুল ইলমের কর্তব্য হলো সেখান থেকেই নিজেকে দূরে রাখা। নচেৎ ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা রয়েছে। তবে ইলম তাদের বাড়িতে বেড়াতে খেলাতে পারে না। তাদের এখানে কিছু খেতে পারে না। নচেৎ ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা রয়েছে। তবে, "আপনার উপার্জন হারাম। এই জন্য আপনারটা খাবো না" এমন করে বলা যাবে না। এটা হিকমতেরও খেলাফ। যা কিছু করার হিকমত ও কৌশলের সঙ্গে করতে হবে। তো প্রথম কাজ হবে নিজে হারাম থেকে বেঁচে থাকা। যেখানে হারামের সামান্য গন্ধ আছে, তালিবুল ইলমের কর্তব্য হলো সেখান থেকে দূরে থাকা। তাদের বিয়ে-শাদিতে, উৎসবে-অনুষ্ঠানে না যাওয়া, তাদের হাদিয়া-তোহফার বিষয়ে সাবধান থাকা। তবে এমনভাবে যাতে ফেতনা না হয়। ফিরিয়ে

দিলে যদি ফেতনা হয় রেখে দেবে, কিন্তু নিজেরা ব্যবহার করবে না, অন্তত নিজে ব্যবহার করবে না। গরীবকে দিয়ে দেবে।

৫. ছাত্র অবস্থায় মোবাইল, ইন্টারনেট, সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহার: মোবাইল, ইন্টারনেট সোস্যাল মিডিয়া ব্যবহারের সর্বনিম্ন ক্ষতি হচ্ছে একাগ্রতাই বিঘ্ন ঘটা, যা ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তির উৎকর্ষে মোবাইল, সোস্যাল মিডিয়াতে এমন সব ফিচার যুক্ত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত যুক্ত হচ্ছে যা গুনাহকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে। দুনিয়ার সকল ক্ষতি যেন এই “মুঠোফোনে”' আক্ষরিক অর্থেই হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, অনেক অভিভাবক সন্তানের আবদার মেটাতে কিংবা ভালো ফলাফল করলে এবং ভবিষ্যতে ভালো পড়াশোনার আশায় সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দেন। অথচ তিনি নিজেই তার সন্তানের ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। তাই তালিবুল ইলমের উচিত মোবাইলকে, সোস্যাল মিডিয়াকে বিষতুল্য মনে করে এর থেকে বেঁচে থাকা। সেইসাথে অভিভাবকদেরও এ ব্যাপারে সতর্ক ও কঠোর পালন করা উচিত।

৬. উস্তাদের সাথে বেয়াদবী: ইলম থেকে মাহরুমীর অন্যতম আলামত উস্তায়ের সাথে বেয়াদবী করা। বর্তমানে যুগে ইলমের অধঃপতনের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে উস্তাদের সাথে তালিবুল ইলমের সম্পর্ক সাময়িক ও প্রয়োজন নির্ভর হয়ে পড়েছে। অথচ উস্তাদের আদব-সম্মান রক্ষা করা ও উস্তাদের দুআ ছাড়া ইলমের বরকত পাওয়া সম্ভব নয়। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)তার ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত গ্রন্থে উস্তাদের হক সম্পর্কিত এমন কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেছেন যেগুলো ইলম থেকে মাহরুমির কারণ হয়ে থাকে। যথা-

১. উস্তাদের আদব রক্ষা না করা।
২. দেখা-সাক্ষাতে সালাম না দেয়া।
৩. উস্তাদের দিকে পিঠ দিয়ে বসা।
৪. তার সামনে পা ছড়িয়ে বসা।
৫. পুরোপুরি আনুগত্য না করা। যেমন: কিছু কথা মানা, কিছু কথা না মানা।
৬. মহব্বতে কমতি থাকা।
৭. ধোঁকাবাজী করা।

৮. মিথ্যা বলা।

৯. ত্রুটি স্বীকার না করে অপব্যাখ্যা করা।

১০. খিদমতে কমতি করা।

জীবনে উন্নতি-অবনতির ক্ষেত্রে উস্তাদের দুআ ও বদ দুআর বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিশেষত যারা তালিবুল ইলম, তাদের দুনিয়া-আখেরাতের কামিয়াবির জন্য উস্তাদের দুআর বিকল্প নেই। উস্তাদের দুআ একজন তালিবে ইলমকে উন্নতির পরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে, আবার উস্তাদের অন্তরের চোট ও ব্যথাও চরম ক্ষতির কারণ হতে পারে।। শুধু ইলমী যিন্দেগীতেই নয়, জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এই উন্নতি ও অবনতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই সম্পর্কে কয়েক যুগ আগের একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা এখানে তুলে ধরা হলো:-

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহঃ) নদওয়াতুল উলামার দায়িত্ব পালনকালে তিনি কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তাঁর এসব পদক্ষেপ ও তার প্রতিক্রিয়ার কথা আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী (রহঃ) লেখেন, 'দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার রূহানি ও ফিকরি তারাক্কীর জন্য সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী (রহঃ) এর নতুন চিন্তা-ভাবনা ও পদক্ষেপগুলোর পক্ষে ছাত্রদের পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায়নি। বরং ভেতরে ভেতরে এক ধরনের অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠে, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল নদওয়ার ১৯৪৩ সালের অনাকাঙ্খিত ছাত্র-ধর্মঘটের মাধ্যমে। যদিও ধর্মঘটের সূচনা হয়েছিল ব্যবস্থাপনাগত কিছু বিষয় থেকে, কিন্তু এর পেছনে মূল কারণ ছিল সাইয়্যেদ সাহেবের গৃহীত সংস্কার উদ্যোগ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ধর্মঘটের নেতৃত্বে ছিল উস্তাদগণের স্নেহভাজন দারুল উলূমের প্রথম সারির ছাত্র। যাদের নিয়ে পুরো দারুল উলূমের অনেক স্বপ্ন ছিল। আন্দোলনের পুরো ভাগে এমন একজন অতি প্রিয় ও স্নেহভাজন ছাত্র ছিলো যে ছিলো মেধাবী, প্রতিভাবান ও রুচিশীল। দ্বিতীয়-তৃতীয় স্তরে পড়ার সময় তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, সাবলিল আরবীতে সে লিখতে ও বলতে পারত। তাতে নাহু-সরফের কোনো ত্রুটি হওয়াও মুশকিল ছিল। যখন সে তৃতীয়-চতুর্থ স্তরের ছাত্র তখন একবার তার পরীক্ষার খাতা দেখে উস্তাদ আরবী সাহিত্যের পন্ডিত মাওলানা খলীল আরব বলেছিলেন, 'খাতাগুলি দিন, এগুলো দেখিয়ে যত বেশি বলুন, নদওয়ার জন্য আমি চাঁদা তুলতে সক্ষম। যখন সে চতুর্থ-পঞ্চম স্তরে পড়ে তখন তাৎক্ষণিকভাবে যে কোনো বিষয়ের উপর আরবী ভাষায় সাবলিলভাবে বক্তব্য দিতে পারত। স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, ঐ বয়সেই ইকবাল, আকবর

ইলাহাবাদী ও যফর আলী খানের মতো কবিদের হাজারো শের তার ঠোঁটস্থ ছিল। এই আন্দোলনের পর যখন সে করাচি গেল, এত কম বয়সী হওয়া সত্ত্বেও করাচির ইলমী ও গবেষণা মজলিসগুলোতে আল্লামা খেতাবে বরিত হতে লাগল। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সে এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার নেতায় পরিণত হলো। এই আন্দোলনে তার অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদানে তার সকল উস্তাদ খুবই উদ্বিগ্ন ছিলো। কারণ এই আন্দোলনের সবচেয়ে বড় আঘাত আসবে সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহঃ)এর ব্যক্তিত্ব ও তার পরিচালনার উপর। কারণ তিনি তখন নদওয়ার প্রধান মুরব্বী ও একমাত্র অভিভাবক। নদওয়ার জন্য তিনি ছিলেন জান কুরবান। এই আন্দোলনের কারণে সাইয়্যেদ সাহেবের অন্তরে খুব চোট লেগেছিল। তাঁর মনে নদওয়ার খেদমত ও ছাত্রদের তারবিয়তের বড় বড় স্বপ্ন ছিল, যা তিনি এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধুলোয় মিশে যেতে দেখলেন। তার সকল সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়ার দৃশ্যও দেখতে পেলেন। তিনি বেচাইন হয়ে গেলেন এবং তাঁর দিল ভেঙ্গে গেল। উস্তাদগনের সেই প্রিয় ছাত্রটি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল। হালত এতই নাজুক হল, আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখতে বাধ্য হলো। বহু চিকিৎসা করানো হলো। একপর্যায়ে তার এক ভাই ডাক্তার সাইয়েদ আবদুল আলী সাহেবকে তার চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেল। মেধা ও প্রতিভায় যে ছিল সবার ঈর্ষার পাত্র, আজ তার এই করুণ অবস্থা! সে সময় সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহঃ) এতই ব্যথিত ছিলেন যে, রাতে দারুল উলূমে থাকতেন না। থাকতেন অন্য উস্তাদের ঘরে। একদিন একাকীত্বের সুযোগে উস্তাদ তাঁর কাছে আবেদন করলেন, 'আমার ধারণা, অমুক ছাত্রটির মুখ থেকে আপনার ব্যাপারে কোনো শব্দ বের হয়ে গিয়েছিল। আন্দোলনের তুফানে এটা অসম্ভব নয় যে, আবেগতাড়িত হয়ে কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ সে করে ফেলেছে। আর হাদীস শরীফে তো আল্লাহ বলেছেন,

من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب

যে আমার কোনো ওলি-বুযুর্গকে কষ্ট দিবে, তার সাথে স্বয়ং আমি আল্লাহ যুদ্ধ ঘোষণা করলাম। আর আপনি তো তার অত্যন্ত মুহসিন অভিভাবক ও শফীক মুরববী! উত্তরে সাইয়েদ সাহেব তাওয়াজু ও বিনয়ের সাথে বললেন, আমিই বা আর তেমন কে?

উস্তাদ পুনরায় একই কথা আবেদন করলেন এবং সেই ছাত্রটির জন্য দুআর দরখাস্ত করলেন। কিন্তু সাইয়েদ সাহেব চুপ রইলেন। কিছুই বললেন না। দুই কি তিন দিন পর। তিনি উস্তাদকে বললেন, 'মৌলভী আলী! আমি আপনার হুকুম পালন করতে পেরেছি।' এখন আপনি একে সাইয়েদ সাহেবের কারামত বলুন বা অন্য কিছু, এর

পরপরই এই ছাত্রটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল। উস্তাদ যতটুকু জানেন যে, দ্বিতীয়বার সে এই রোগে আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু খুব কম বয়সেই ১৯৫০ সালে ক্ষণিকের জ্বলে উঠা এই প্রদীপ শিখা চিরদিনের জন্য নিভে গেল।

حسرت ان غنچوں پہ جو بن کھلی مرجھا گئی

আফসোস! ঐ কলির তরে, না ফোটেই যা গেল ঝরে। (পুরানে চেরাগ ১/৪০-৪২)

এই মর্মস্পর্শী ঘটনাটি তালিবুল ইলমের জন্য সতর্কবার্তা। উস্তাদদের ছায়ায় থেকে তাঁদের খেদমতে সঁপে দিতে না পারে, যদিও এটিই ছিল একজন প্রকৃত তালিবুল ইলমের প্রধান কাজ, অন্তত এতটুকু সতর্ক তো অবশ্যই থাকতে হবে যে, আমার কাজ-কর্মে এবং আচরণ-উচ্চারণে আমার উস্তাদকে 'উফ' বলতে না হয়।

৭. অহংকার করা: অহংকার অত্যন্ত নিকৃষ্ট আত্মার রোগ। হাফেয যাহাবী বলেন, *অহংকারের সবচেয়ে নিকৃষ্টতম প্রকার হলো ইলমের অহংকার। কেননা তার ইলম তার কোন কাজে আসেনা। যে ব্যক্তি আখেরাতের জন্য জ্ঞানার্জন করে, জ্ঞান তার অহংকারকে চূর্ণ করে দেয় এবং তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। যে নিজেকে হীন মনে করে এবং সর্বদা নিজের হিসাব নিয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। একটু উদাসীন হলেই ভাবে এই বুঝি সিরাতে মুস্তাক্বীম থেকে বিচ্যুত হলাম ও ধ্বংস হয়ে গেলাম। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ইলম শিখে গর্ব করার জন্য ও নেতৃত্ব লাভের জন্য, সে অন্যের উপর অহংকার করে ও তাদেরকে হীন মনে করে। আর এটিই হলো সবচেয়ে বড় অহংকার (أَكْبَرُ الْكِبْرِ)। আর ঐ ব্যক্তি কখনই জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তর কণা পরিমাণ অহংকার রয়েছে। (যাহাবী, আল-কাবায়ির (বৈরূত : দারুন নদওয়াতুল জাদীদাহ পৃঃ ৭৮)*

حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي مَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي جَهَنَّمَ .

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, অহংকার আমার চাদর, মহানত্ব আমার লুঙ্গি। কেউ এ দু'টির কোন একটি নিয়ে আমার সাথে বিবাদ করলে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো। (সুনান ইবনু মাজাহ, হাদিস ৪১৭৪)

বলা হয়, ইলমের আপদ হচ্ছে অহংকার।

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
يَظْهَرُ قَوْمٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، يَقُولُونَ: مَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَفْقَهُ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: هَلْ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: أُولَئِكَ مِنْكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، فَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

"এমন একদল লোক প্রকাশ পাবে যারা কুরআন পাঠ করবে (দ্বীনী ইলম শিক্ষা করে কারী ও আলেম হবে)। তারা (বড়াই করে) বলবে, "আমাদের চেয়ে ভালো কারী আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় আলেম আর কে আছে? আমাদের চেয়ে বড় ফকীহ (দ্বীন-বিষয়ক পণ্ডিত) আর কে আছে? অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাগণের উদ্দেশ্যে বললেন, ওদের মধ্যে কি কোন প্রকারের মঙ্গল থাকবে? সকলে বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, ওরা তোমাদেরই মধ্য হতে এই উম্মতেরই দলভুক্ত। কিন্তু ওরা হবে জাহান্নামের ইন্ধন। (সহীহ তারগীব, ১৩৫)

ইলম নিয়ে অহংকার কারীর দুনিয়াতে পরিণতি হলো ইলম থেকে মাহরুমী এবং পরকালের পরিণতি হলো জাহান্নাম।

ইলম থেকে মাহরুমী সম্পর্কে কিছু ঘটনা

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ (হাফি:) এর দরদী মালীর কথা শোনো বই থেকে ইলম থেকে মাহরুমী সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

ঘটনা ১: এক তালিবে ইলম চতুর্থবর্ষে পড়ে। জানা গেলো, তার বাবা কিস্তির টাকা থেকে ছেলের খরচ দিয়ে যাচ্ছে, এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না বলে ছেলেকে নিয়ে যাবে। কোন কাজে লাগিয়ে দেবে সংসারের কিছুটা হাল ধরার জন্য। তালিবুল ইলম সবকিছু জেনেও নির্বিকার। আমাদের তো দিশেহারা অবস্থা এত দিন তাহলে এর মাধ্যমে হারামের টাকা আমাদের মাদরাসায়ও ঢুকেছে। পিছনের অর্থ ফেরত দিয়ে সামনের জন্য তাকে আমরা মাদরাসার খাছ মেহমানরূপে গ্রহণ করেছি। অভিভাবককে সুদের অভিশাপ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছি। তিনি বলেন, হুযূর, তাহলে এখন আমার বাঁচার উপায় কী? আমি তো এখন কিস্তি শোধ করা নিয়েই দিশেহারা। আমরা তাকে

কর্যে হাসানা দিয়েছি, মাসে মাসে পরিশোধ করার ভিত্তিতে মাদরাসার উছিলায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাকে এই অভিশাপ থেকে উদ্ধার করেছেন।

ঘটনা ২: একজন মায়ের কথা মনে পড়লো। ফোন করে কান্নাকাটি করলেন। এত আশা করে ছেলেকে মাদরাসায় দিলাম। দ্বীন শিখবে, আমরা কবরে শান্তি পাবো। এখন তো ছেলে বলে মাদরাসায় পড়বে না! এটা আমার দুর্বলতা যে, এসময় পর্দার কথাটাই আমার মনে এসে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম। খুব আস্থার সঙ্গে বললেন, তিনি পর্দা করেন, বোরকা ছাড়া বের হন না। প্রশ্ন করলাম, দেবরের সঙ্গে? ভাসুরের সঙ্গে? শরমে পড়ে গেলেন। আমি বললাম, আপনার লজ্জার কিছু নেই। এটা তো আমাদের সমাজব্যবস্থারই বাস্তবতা। আপনাকে সেই পরিবেশই দেয়া হয়নি যাতে আপনি পূর্ণ পর্দা রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু সন্তানের চেয়ে মূল্যবান আপনার কাছে কী আছে? সন্তানের কল্যাণের জন্য তো যে কোন প্রতিকূলতার মোকাবেলা আপনাকে করতেই হবে। কিসসা মুখতাছার। মায়ের মধ্যে পরিবর্তন এলো। ছেলের মধ্যেও আল্লাহর রহমতে পরিবর্তন এলো। অনেক ঝড়ঝাপটার মোকাবেলা মাকে করতে হয়েছে তার স্বামীর সংসারে। কিন্তু তিনি অবিচল ছিলেন। ঔষধটা তার মধ্যে ভালো কাজ করেছিল, সন্তানের চেয়ে মূল্যবান আপনার কাছে কী আছে?

ঘটনা ৩: আমাদের মাদরাসার একজন তালিবে ইলমকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ভাবী আছে? বলল: আছে। ভাবীর সাথে দেখা দাও? বলল: জ্বী। ভাবীর সঙ্গে পর্দা করা যে জরুরি জানো? বলল: জ্বী না। তোমার আব্বা কোথায়? বলল: হজ্বে গিয়েছেন। হজ্ব থেকে ফেরার পর দেখা করতে বলো। তিনি এলেন। প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলাম। তিনি অদ্ভুত এক ভঙ্গি করে বললেন, আর কইয়েন না হুযূর, একছাদের নীচে থাকলে যা অয় আর কি! মোটামুটি যদ্দুর সম্ভব হলো বুঝিয়ে বললাম, ঘরে যদি পর্দা রক্ষা করতে না পারেন তাহলে কিন্তু আপনার ছেলের ইলম থেকে মাহরুম হওয়ার আশঙ্কা আছে । তিনি গুরুত্ব দিলেন না। ছেলেটাও না। এরপর বছর ঘুরলো না, ছেলেটি ঘুরে গেলো। লেখাপড়া থেকে, মাদরাসা থেকে, মাদরাসার শিক্ষা থেকে তার মন উঠে গেলো। এখনো মনে পড়ে তার মন্তব্যটা, মনে পড়ে আর কষ্ট হয়- "ফকিরি পরা পরুম না।" আমাকে বলেনি, তবে আমার কানে এসেছে। বংশালের দিকে বাড়ি ছেলেটার। জানতে বড় ইচ্ছা করে, ফকিরি পড়া না পড়ে সে কতটা ধনী হয়েছে?

ঘটনা ৪: একটা নমুনা আমাদের আশরাফাবাদেই আছে, ছেলেটাকে বাঁচানোর জন্য আমি সাধ্যের বাইরেও চেষ্টা করেছি। এমন কিছু মেধাবী ছিলো না, তবে আমার উপর তার ছোট্ট একটি ইহসান ছিলো। তাকে বলেছিলাম, আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করে তোমার ভবিষ্যতের যিম্মা আমি নিলাম। চারপাশে তোমার বয়সের যারা আছে, তুমি তাদের চেয়ে সচ্ছল জীবন যাপন করবে ইনশাআল্লাহ। তার এক কথা, "ফকিরি পড়া পড়বো না। ভবিষ্যতে আমার ভিক্ষা করার ইচ্ছা নাই।" তৃতীয়বর্ষে ওঠার পর ছেলের মুখে এই কথা! চলে যাওয়ার পরো দু'বছর পর্যন্ত চেষ্টা করেছি, 'এখনো তুমি ফিরে এসো।' কারণ একটাই; আমার উপর তার ছোট্ট একটি ইহসান ছিলো। ছেলেটি আর ফিরলো না। ভর্তি হলো আমাদের চোখের উপর কাছের স্কুলে। ছেলেটি এখনো আছে আমাদের চোখের সামনে, ফকির না হলেও কাছাকাছি। তারও বাড়িতে পর্দা ছিলো না। এই যে ছেলেটা ইলম থেকে মাহরুম হলো, আমার কিন্তু প্রবল ধারণা, এর বড় কারণ হলো পর্দার শিথিলতা। এজন্য তালিবুল ইলমের বাবা-মায়ের কর্তব্য হলো শরীয়তের বিধান যে পর্দা সেই পর্দা পালন করা। নামকাওয়াস্তে যে পর্দা সেটা যেমন নয়, বাড়াবাড়ি স্তরের যে পর্দা সেটাও নয়।

এখন তো আমার বেরাদরির কেউ কেউ বলে, এটা নাকি আমার বাড়াবাড়ি। হতেও পারে। তবে জিনিসটা পেয়েছি আব্বার কাছ থেকে, আম্মার কাছ থেকে। আমি অবশ্য প্রয়োগ করছি, একটু আধুনিক কৌশলে। কি সেটা? আমার ছেলেকে যেদিন তার মা পর্দার কথা বললো, দেখি মনটা খারাপ, মেজাজটা চড়া। কিছু বলে না, সবকিছুতে অসন্তোষ ধরা পড়ে। তো আমি বললাম, বাবা, পর্দার হুকুম শুধু তোমার উপর নয়। আমার উপরেও। দেখো, তোমার খালাদের সামনে কী স্বচ্ছন্দে তুমি চলে যাচ্ছো। আমি যেতে পারি না। তুমি আমাকে থামিয়ে দিতে পারো যে, আব্বু ওদিকে যেয়ো না, খালারা আছেন। এদিকে আমার ভাগিনি, ভাতিজিরা আমার কাছে আসতে পারে, কিন্তু তোমার জন্য নিষেধ। তো তুমি এটা কেন মনে করছো যে, পর্দার হুকুম শুধু তোমার জন্য? বাধাটা শুধু তোমার ক্ষেত্রেই? একখানে তুমি অবাধ, আমার জন্য বাধা, আরেকখানে আমি অবাধ, তোমার জন্য বাধা। এটা আল্লাহর নেযাম। আমাকেও মানতে হবে, তুমিও মানলে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে । এরপর দেখি, ছেলের আর অসন্তোষ নেই। তাই বলছিলাম আব্বা আম্মা ছিলেন খুব কড়া। আমিও অনমনীয়, তবে কোমল এবং যুক্তিমনস্ক।

ঘটনা ৫: একভদ্রলোক তার ছেলেকে নিয়ে এলেন। চোখের পানিতে চেহারা ভাসিয়ে বললেন, কোনভাবেই ছেলেটাকে মানুষ করা যাচ্ছে না। আজ থেকে বিশবছর আগের ঘটনা। এখনো ভদ্রলোকের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। ছেলেটার কিন্তু ইলম আর নসীব হয়নি। কথাপ্রসঙ্গে জানা গেলো, তিনি ঢাকা শহরের প্রসিদ্ধ এক মসজিদের সভাপতি, খতীব ও দেশবিখ্যাত আলিম। তাকে মসজিদ থেকে সরানোর আন্দোলন হলো এবং ভয়াবহ আন্দোলন। সভাপতি ছিলেন আন্দোলনের নেতৃত্বে। ঐ খতীব আমার পছন্দের মানুষ নন। কিন্তু আমি বললাম, আপনি তো আপনার ছেলের সর্বনাশ করে বসে আছেন! ঐ আলিম দোষী, কি নির্দোষ তা আমি জানতে চাই না। আমি শুধু বলতে চাই, আপনি একজন আলিমকে বে আবরু করেছেন। আপনার ছেলের জন্য এটা সর্বনাশের বিষয়। আপনি এখনই যান, তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে তাকে খুশী করার চেষ্টা করুন। পরের ঘটনা থাক। তিনি ওয়াদা করলেন, ঐ আলিমের সঙ্গে মু'আমালা ছাফ করে নেবেন, কিন্তু ওয়াদাটা রক্ষা করলেন না। তার ছেলে। তিন বছর ছিলো আমার কাছে। হলো না কিছু, বরং এখন আছে, তিনি বলেন, 'সউদীতে', আমি বলি, মক্কা শরীফে এবং জিদ্দায়। এখনো তার জন্য দু'আ করি, আলিম না হোক অন্তত মানুষ যেন হয়।
যারা মাদরাসার প্রশাসনে আছে, কমিটিতে আছে, তাদের আমি সবসময় বলি, বহু ঘটনা আছে আমার জীবনে, আমি বলি, নিজের ছেলেকে ঐ মাদরাসায় তো দিবেনই না, বরং ছেলের ভালো চাইলে আপনি ঐ পদ থেকে ইসতিফা দিন। কারণ পদের মজবুরিতে আলিমদের সঙ্গে অসদাচরণ হয়েই যায়। আর এটা বড় খতরনাক। আপনার ছেলে বড়, না কমিটির পদ বড়।

ঘটনা ৬: এত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সৌভাগ্যের কথা বলতে চাই। এখনই মনে পড়লো ছেলেটির কথা। বেশ সচ্ছল বাবার সন্তান। কিন্তু মায়ের ধারণা, স্বামীর উপার্জনের ধরন সন্তোষজনক নয়। মা বললেন, হুযূর, আমার ছেলেকে আমি দ্বীনের ইলম শিক্ষা দিতে চাই। ছেলের বাবাও চায়। কিন্তু তার ‘রোজগার ঠিক না'। আমি চাই মাদরাসা থেকে প্রতিমাসের খরচের টাকাটা আমাকে কর দেয়া হোক। আশা করছি, আমার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তখন আমি শোধ করে দেবো। জীবনে প্রশান্তির অল্প যে ক'টি মুহূর্ত পেয়েছি তার মধ্যে এটি একটি। সেই ছেলে খুব মেধাবী ছিলো না। সাধারণ আলিমই হয়েছে। সাধারণ উপার্জনই করছে। কিন্তু সে আমার মাদরাসার গর্ব। তার মাও বলতো, এ সন্তান আমার গর্ব।

ঘটনা ৭: একজন বলেছিলেন, আমি মাদানি নগর মাদরাসার ‘গভর্নিং বডি'র সদস্য। আমি বিনয়ের সঙ্গে বললাম, ছেলেকে আমার এখানে পড়াতে হলে ঐ পদ থেকে আপনাকে আলগ হতেই হবে। তিনি আলগ হয়েছিলেন, আল্লাহর রহমতে তার ছেলে আলিম, মুফতি হয়েছে।

এখন তালিবে ইলমের করণীয় কী? তার বাবার যদি কোন আলিমের সঙ্গে সমস্যাপূর্ণ আচরণ থাকে, সুযোগমত তার কাছে যাওয়া এবং তার সঙ্গে আদবের আচরণ করা, যাতে তার মনে কোন কষ্ট থাকলেও তা হালকা হয়ে যায়, আর তোমার প্রতি অন্তত সুধারণা সৃষ্টি হয়। কিছু কারণ আছে যেগুলো থেকে বেচে থাকা আল্লাহ চাহে তো তালিবুল ইলমের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলমের পথের সকল বাধা থেকে বেঁচে থাকার এবং ইলম হাসিলের যাবতীয় আসবাব ইখতিয়ার করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

দ্বীনি ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি

১. ইসলামের একটি সৌন্দর্য হলো দ্বীনি ইলম চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাকে বাধা দেওয়া। ইসলাম একদিকে যেমন ইলম অর্জনের সুযোগ সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে। অন্যদিকে সঠিক উপায়ে ইলম অর্জন না করাকেও কোনোভাবে সমর্থন করে না। ইসলামী নীতি হলো ইলম অর্জনের সুযোগ সবার জন্য মুক্ত আর সঠিক উপায়ে ইলম অর্জন ছাড়া ইলমী সিদ্ধান্ত দেওয়া নিষিদ্ধ। তাই ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি সম্পর্কে জানাও প্রয়োজন।
জ্ঞান জ্ঞানর্জনের সঠিক ও প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে, শিক্ষক শেখাবেন, ছাত্র শিখবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে। (সহীহ বুখারী ১/২৪)

২. সঠিক ইলম অর্জনের জন্য শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থি আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে

ভুল বা বিপরীত বুঝার সম্ভাবনা আছে। যা শিখেছে তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা জ্ঞানের সল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ দিলে খটকা লাগতে পারে যা হতে পারে ইলম অর্জনের পথে বিরাট ক্ষতির কারণ। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنَ الصّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়। (আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩)

সালাফের এক জ্ঞানী ব্যক্তির বাস্তবসম্মত উক্তি,

من اعظم البلية تشيخ الصحيفة

'শুধু বই-পত্র উস্তাযে পরিণত হওয়া এক মহাবিপদ।'

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর 'আলমুআফাকাত' গ্রন্থে লিখেছেন,

قالوا إِنّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে। (আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০)

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

৩. তালিবুল ইলমকে ইলম অর্জনের জন্য আলিমগণের সোহবতে থেকে আলিমগণের নিকট থেকে ইলম অর্জন করতে হবে। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন,

خُذُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ'

ইলম অর্জন কর তা বিদায় নেওয়ার আগে'।

সাহাবীগণ আরয করলেন,

وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَفِينَا كِتَابُ اللَّهِ

আল্লাহর নবী! ইলম কীভাবে বিদায় নেবে, আমাদের মাঝে তো রয়েছে আল্লাহর কিতাব? বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় তিনি রুষ্ট হলেন। এরপর বললেন,

تَكِلَتْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ أَوَلَمْ تَكُنِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمْ شَيْئًا؟ إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ، إِنَّ ذَهَابَ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُه

তোমাদের মরণ হোক! বনী ইসরাইলের মাঝে কি তাওরাত ও ইঞ্জীল ছিল না, কিন্তু এতে তো তাদের কোনোই উপকার হল না! ইলমের প্রস্থানের অর্থ তার বাহকগণের প্রস্থান। (মুসনাদে আহমদ ৫/২৬৬; আদদারেমী ১/৮৬, হাদীস ২৪৫)

হাদীসের শুরুতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন 'ইলম গ্রহণ কর তা বিদায় নেওয়ার আগে'। এরপর 'ইলম বিদায় নেওয়ার' অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইলম বিদায় নেওয়ার অর্থ আলিমগণের বিদায় নেওয়া। তাহলে এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের বাহক তথা আলিমগণের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করতে বলেছেন।

কুরআনে কারীমের এই আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল পদ্ধতি হল আলেমদের সোহবতে থাকা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون

"সুতরাং তোমরা জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর, যদি তোমরা না জেনে থাক" (সূরা ১৬/ নাহলঃ আয়াতঃ ৪৩)

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) কে জানানো হল যে,

'في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه

অমুক মসজিদে কিছু লোক একত্র হয়ে ফিকহ বিষয়ে আলোচনা করে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

ألهمْ رأس

তাদের কোনো মাথা (শিক্ষক) আছে কি?

বলা হলো- لا

জ্বী না।

তিনি বললেন,

لا يفقهونَ أبدا

এরা কখনো ফিকহ অর্জনে সমর্থ হবে না।'

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ). বলেছেন,

مَنْ تَفَقَّهَ مِنْ الْكُتُبِ ضَيَّعَ الْأَحْكَام

যে (শুধু) বইপত্র থেকে ফিকহ অর্জন করে সে (শরীয়তের) বিধিবিধান ধ্বংস করে। (আলমাজমু' শরহুল মুহায্যাব ১/৩৮)

৪. জ্ঞানার্জনের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে শিক্ষক নির্বাচন। অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানা শোনা নেই এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা। এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, যার থেকে ইলম গ্রহণ করেছি সে হকপন্থী কি না তা জানা থাকতে হবে। অথবা জানা শোনা আছে এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন সেটা লক্ষ করতে হবে। কারণ যার হাত ধরে জ্ঞানের অথৈ সমুদ্রে যাত্রা করবে তার জ্ঞান যদি ভুল বা অসম্পূর্ণ হয় তাহলে ছাত্রও মাঝ পথে ডুবে যাবে। তাই শিক্ষক নির্বাচনে খুবই সতর্ক থাকা জরুরী।

বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সিরিন (রহঃ). বলেন,

إِنّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُم

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহর ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ। (সহীহ মুসলিম ১/১৪)

শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের আকিদা কি তা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আদর্শে আদর্শবান শিক্ষকের অনুসারী হতে হবে তাহলে ছাএও দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। কারণ একজন ছাত্র সাধারণত তার শিক্ষককে অনুসরণ করে ফলে সে শিক্ষকের পথ ও মতকে অবচেতন মনেই আকড়ে ধরে থাকে এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে। পক্ষান্তরে শিক্ষক যদি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হন, তাহলে ছাত্রও খুব সহজেই ভ্রান্তির শিকার হবে এবং যা মন মগজে আসন গেড়ে বসবে ফলে ছাত্রের দ্বীন-দুনিয়া উভয়টিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

মুহাম্মাদ বিন সীরীন (রহঃ)) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রঃ) সনদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন না। কিন্তু যখন ফিতনার (খাওয়ারিজদের আত্মপ্রকাশ) দুয়ার খোলে গেল, তাঁরা সনদ জিজ্ঞেস করা শুরু করলেন। তাঁরা বলতেন, তোমরা বর্ণনাকারীর নাম বলো। যদি দেখা যেত বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত, তাহলে হাদিস গ্রহণ করতেন। পক্ষান্তরে বর্ণনাকারী আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ বহির্ভূত কোন

বিদআতি হলে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করতেন তার বর্ণনা। (মুকাদ্দিমাতু মুসলিম সূত্রে লামাহাতুম মিন তারীখিস সুন্নাহ ওয়া উলুমিল হাদিস, পৃষ্ঠা নং ৭৩, আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ (রাহিঃ)।

শিক্ষক আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পাশাপাশি তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং আদর্শবান হন কি না জানার জন্য কয়েকটি বিষয় খেয়াল করা জরুরি। যেমন:

১. তার শিক্ষক কে তা জানতে হবে।

২. তার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। ক্লাসে তার মনোযোগ, অধ্যয়নের ব্যপ্তি, পরিক্ষার ফলাফল, শিক্ষকের কাছে তার অবস্থান, তার কোন থিসিস বা উচ্চতর ডিগ্রি থাকলে তাও খোঁজ নিতে হবে।

৩. তার সম্পর্কে সমকালীন হক্কানী ওলামায়ে কেরামের মতামত জানতে হবে।

৪. আদাবুল ইলম তথা ইলমী শিষ্টাচার তার মধ্যে বিদ্যমান আছে কি না তার খোঁজ নিতে হবে। বিনয়, তাকওয়া, ভিন্ন মতাদর্শের আহলে ইলমের সাথে তার আচরণ ইত্যাদি লক্ষ্য করতে হবে।

৫. উম্মাহর পূর্বসূরি আলেমদের আলোচনা তিনি সম্মানের সাথে করেন কি না সেটা জানতে হবে। পূর্বসূরি আইম্মায়ে কেরাম উম্মাহর জন্য জ্ঞানের যে বিশাল ভাণ্ডার রেখে গেছেন, তিনি কি তার স্বীকৃতি দেন? ইলমের এই আমানত উম্মাহর কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে তাদের সুদীর্ঘ সফর, ক্ষুধার অসহ্য জ্বালা, রাত জেগে জ্ঞানার্জনসহ যে সকল অসম্ভব কষ্ট করেছেন, তিনি কি সে জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হয় নাকি তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের যুগে নিজের জ্ঞানকে তাদের থেকে বেশি মনে করেন খোঁজ নিবে।

এসকল বিষয় ভালোভাবে অনুসন্ধান করলে আশা করা যায় ছাত্র একজন আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্য পেতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. দ্বীনের ব্যাখ্যা, বিধান, যে কোনো দ্বীনি ইলম জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকের নিকট গ্রহণ না করা। আজকাল কিছু সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ও নানা পেশায় নিয়োজিত লোকদের মাঝে এ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যারা নিজেরা নিজেরা দ্বীনি বিধান নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং খেয়াল খুশি মতো নতুন নতুন সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন।

এ জাতীয় গবেষণার বা আলোচনার পরিমাণ ইলম নয়, বরং গোমরাহী। এভাবে দ্বীনি ইলম অর্জন করা যায় না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রঃ. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

আল্লাহ তাআলা এলমকে এমন ভাবে তুলে নিবেন না যে বান্দাদের (অন্তর) থেকে তা তুলে নিলেন; বরং ইলমকে তুলে নিবেন আলিমদের তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। অবশেষে যখন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা বেইলম লোকদের নেতা বানাবে আর তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দিবে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হবে, অন্যদের গোমরাহ করবে। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০)

একজন প্রকৌশলী প্রকৌশল বিষয়ে যোগ্য হলেও চিকিৎসা শাস্ত্রে অযোগ্য তাই চিকিৎসা সম্পর্কীত জ্ঞান প্রকৌশলী থেকে নেওয়া যাবে না। তেমনি, বিশেষ কোনো শাস্ত্রে পারদর্শী ব্যক্তির কাছে অন্য শাস্ত্রের সমাধান চাওয়া অযোগ্য লোকের উপর কর্মের ভার অর্পন করার মধ্যেই পড়ে। তাই দ্বীনি বিষয়ের সিদ্ধান্ত অবশ্যই দ্বীনি বিষয়ে পারদর্শী ব্যক্তিদের থেকে নিতে হবে, এখানে সাধারণ লোকদের অনুপ্রবেশ নিন্দিত বিবাদের শামিল।

জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন আমানত বিনষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন, আমানত কীভাবে বিনষ্ট করা হয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

যখন অযোগ্য লোকের উপর কর্মের ভার অর্পণ করা হবে তখন কেয়ামতের অপেক্ষা কর। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৯)

৬. দ্বীনি বিষয়ে ফতোয়া বা সিদ্ধান্ত যেমন জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের নিকট নেওয়া ভুল তেমনি দ্বীনি ক্ষেত্রেও এক শাস্ত্রের বিষয় অন্য শাস্ত্রের লোকের নিকট থেকে নেওয়া ভুল। দ্বীনী ক্ষেত্রে কোন বিষয় কার নিকট থেকে গ্রহণ করবে সে সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে, ওয়ায়েজ বা আলোচক মাত্রই বিজ্ঞ আলিম ও

ফকীহ হওয়া অনিবার্য নয়। সুতরাং কোনো কুশলী আলোচকের সুন্দর উপস্থাপনার কারণে আলোচনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার সুযোগ নেই।

অনলাইন থেকে সঠিক পন্থায় জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি

অফলাইন ছেড়ে অনলাইনের মাধ্যমে ইলম অর্জনের কারণ: ১. বর্তমানে অফলাইন মাদরাসার পক্ষ থেকে যেকোনো বয়সী মানুষের জন্য ইলম অর্জনের সুযোগ থাকলেও দুনিয়াবি, পেশাগত ও সাংসারিক নানান ব্যস্ততার কারণে তালিবুল ইলমের পক্ষ থেকে মাদরাসায় যাওয়ার সুযোগ থাকেনা।

২. অনেক সময় তালিবুল ইলমের সুযোগ থাকলেও মাদরাসাতে সকল বয়সী তালিবুল ইলমের জন্য সুযোগ থাকেনা। তখন তালিবুল ইলম অনলাইনের মাধ্যমে ইলম অর্জন করবে। কিন্তু যদি নিকটস্থ কোনো মাদরাসাতে পড়ার সুযোগ হয়ে যায়, তবে অবশ্যই অফলাইন মাদরাসাকে প্রাধান্য দিতে হবে। তখন অনলাইনে ছোট-খাট কোর্স করা যেতে পারে, তবে যদি সম্ভব হয় তাহলে দীর্ঘমেয়াদী ইলম অর্জনের জন্য উচিত অফলাইনে ভর্তি হওয়া ।

৩. বেশিরভাগ সময়ে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য অফলাইনে আবাসিকে থাকার সুযোগ হয়ে উঠে না পরিবার থেকে। অন্যদিকে বাড়ি থেকে মাদরাসার যাতায়াত দূরত্বও বেশ লম্বা। তখন ইলম অর্জনের জন্য অনলাইন মাদরাসার দারস্থ হবে।

অনলাইন থেকে সঠিক পন্থায় জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি: বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির উৎকর্ষের এই যুগে ইন্টারনেটের ব্যবহার দিন দিন সহজ ও গতিময় হচ্ছে। ফলে অনেকেই ইন্টারনেট থেকে বিভিন্ন মাধ্যমে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করছেন। এ ক্ষেত্রে কোনো নিয়মনীতি অনুসরণ না করে দেদারসে তথ্য সংগ্রহ করছে ফলে অনেকে সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ির শিকার হচ্ছে। ভুল বা অম্পূর্ণ তথ্যের উপর ভিত্তি করে অন্যের সাথে দাম্ভিকতা দেখাচ্ছে। অহেতুক বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হচ্ছে। তাই অনলাইন থেকে সঠিক পন্থায় জ্ঞানার্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা জরুরি।

তাহলে জেনে নেওয়া যাক ইন্টারনেট থেকে সঠিক পন্থায় জ্ঞানার্জনের জন্য কিছু পদ্ধতি:
১. ইন্টারনেট থেকে অনেকেই বিভিন্ন আর্টিকেল বা পিডিএফ বুক ডাউনলোড করে পড়ে ফলে নানাধরনের তথ্য বিভ্রাটও দেখা যায়। এইজন্য অনুসন্ধানী মানসিকতা নিয়ে পড়তে হবে যেন তথ্য বিভ্রাট থেকে বাঁচা সহজ হয়। যেকোনো আর্টিকেলের তথ্যগুলো সঠিক কি না জানার জন্য উৎসমূল অনুসন্ধান করার পদ্ধতি অনুসরণ করা অতি জরুরি। আর পিডিএফ বুক মূল বইয়ের সাথে মিলিয়ে নিতে। উৎসমূল অনুসন্ধান না করলে কত বড় তথ্য বিভ্রাটের ফাঁকে পড়ার আশঙ্কা আছে এই ব্যাপারে বড়দের একটি ঘটনা: তিরমিযী শরীফের একটি হাদিস উল্লেখ করতে গিয়ে এক ব্যক্তি আলি ইবনুল মাদীনী রাহিমাহুল্লাহর কথাকে নবীজীর হাদিসের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন! তিরমিযী শরীফ খোলে বিষয়টি নিশ্চিত হই।

২. অনেকেই অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে কোর্সের ক্লাস করে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচনে যেসব বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ফলো করতে হবে।

৩. ইন্টারনেট থেকে অনেকেই ভিডিও লেকচার, ওয়াজ শুনে থাকে। বর্তমানে অনলাইন-অফলাইনে বক্তাদের সংখ্যা অসংখ্য। কিন্তু সঠিক তথ্য সমৃদ্ধ বক্তার সংখ্যা খুবই কম। ফলে ইসলাম প্রচারের জন্য এই বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে বিবেচনা করা যাচ্ছে না। অধিকাংশ বক্তার বক্তৃতায় ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্যের উপস্থিতি ব্যাপক। বিজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছে খুব সহজেই এসব তথ্য বিভ্রাট ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়টি বক্তার ক্ষেত্রেও খেয়াল রাখতে হবে। তথ্য সূত্র উল্লেখ করলে উৎসমূল অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। ওলামাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিতেই অনেক বক্তার বড় বড় ভুল চোখে পড়েছে বিধায় মঞ্চে সিংহাসন অলংকৃত যেকোন বক্তার কথা চোখ বুজে মেনে নেওয়া যাবে না। যথাসম্ভব অনুসন্ধান করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সবাইকে দ্বীনের সঠিক জ্ঞান অর্জন করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমিন।

অনলাইনে ইলম অর্জনে ছাত্র ছাত্রীদের করনীয় ও বর্জনীয়: অনলাইনে ইলম অর্জনে ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে এখানে ২টি এমন পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করা হলো যেগুলো অনলাইনের জন্যই নির্দিষ্ট:

১. ঘনঘন ড্রপআউট হয়ে যাওয়া: তালিবুল ইলমকে যেকোনো কোর্সের সাথে আন্তরিক ভাবে লেগে থাকাতে হবে। অনলাইনে দ্বীন শিক্ষার ক্ষেত্রে ড্রপআউট হয়ে যাওয়ার সমস্যাটা প্রকট। অধিকাংশ কোর্সের শুরুতে দেখা যায় অনেকজন শুরু করলেও কিছুদিন পরই শিক্ষার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে থাকে, অতঃপর শেষের দিকে প্রায় একেবারেই কমে যায়। স্বল্পমেয়াদী কোর্সের চাইতে দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে ড্রপআউট এর হার অনেক বেশি থাকে।

২। ঘনঘন এক কোর্স চলমান অবস্থায় অন্য কোর্সে যাওয়া: প্রায়ই দেখা যায় কোনো একটা কোর্সে থাকা অবস্থায় তা শেষ না করেই অন্য একটা কোর্সে চলে যায়। ফলে ইলমের ক্ষেত্রে শেখার জগতে অগ্রগতি হয় না, একই জায়গায় পড়ে থাকা হয়। এজন্য ঘনঘন কোর্স বদল না করে একই জায়গায় সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করা উচিত, এরপর অন্য কোথাও কোর্স শুরু করা উচিত। সব একসাথে শিখতে গিয়ে কিছুই ভালোভাবে শেখা হয়ে উঠে না ফলে জানাটাও আর পরিপক্ক হয় না। তবে, অনেক মেধাবী আছে যারা একসাথে একাধিক কোর্স চলমান রাখতে পারে এবং সবগুলোতে সফলও হয়। এমন অতি মেধাবীদের কথা ভিন্ন। কিন্তু সাধারণের উচিত নির্দিষ্ট একটি জায়গাতেই লেগে থেকে শেখা। যে সত্যিকার অর্থেই এক জায়গাতে লেগে থাকবে, সে অনেক ভালো শিখবে। আর যে একটার পর একটা কোর্স বদল করতে থাকবে, দীর্ঘ সময় পরেও তাদের জ্ঞান থাকবে ভাসা-ভাসা।

তালিবুল ইলমের গুণাবলী

একজন তালিবুল ইলম হলো ইলমে ওহীর তালেব, ইলমে নাফীর তালেব। সে হিসেবে তালিবুল ইলমের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চলা ফেরা সবকিছু থেকে যেন বুঝা যায় যে, সে সত্যিকারার্থেই তালিবুল ইলম।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহঃ লেখেন, ইলমকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা শুরু থেকেই দুঃখ-কষ্ট ও ধৈর্যের সাথে জড়িয়ে রেখেছেন। সুউচ্চ হিম্মত, সুদৃঢ় মনোবল, ইলমী গাইরত, দুনিয়া বিমুখিতা, মিতব্যয়িতা, রাত্রি জাগরণ, সাধনা-

মোজাহাদা, দোয়া-রোনাজারি, ইলমী সফর, ইলমের উৎস সন্ধান, যোগ্য উস্তাদ তালাশ করা; তাঁদের প্রতি বিনয়-নম্রতা ও আনুগত্য, তাঁদের সম্মান করা, শোকর করা- এইসব তালিবে ইলমের অপরিহার্য গুণাবলী।

১. বিশুদ্ধ নিয়ম: তালিবুল ইলম সবসময় বিশুদ্ধ নিয়তে ইলম অর্জন করবে। একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি, বিশুদ্ধ আমল, দ্বীন ও শরীয়তের পুনর্জীবন, ইলমের নূর দ্বারা অন্তরকে আলোকিত করা, অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা অর্জন এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নৈকট্য অর্জনের নিয়তে ইলম অর্জন করবে।

সুফিয়ান সাওরী বলেন, নিয়তের চাইতে কঠিন কোনো বিষয়ের মুখোমুখি আমি হইনি; যার মাধ্যমে দুনিয়ার স্বার্থ তথা নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব, পদ ও পদবি, অর্থ-সম্পদ উদ্দেশ্য হয় না। উদ্দেশ্য হয়না সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করা, মানুষের সম্মান প্রাপ্তি বা নেতৃত্বের আসন অলংকিত করা। ভালোর বিনিময়ে মন্দ পেয়ে তাঁরা বরং সন্তুষ্ট থাকে।

ইমাম নববী (রহঃ) লেখেন, তালিবে ইলম স্বীয় ইলমের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি কামনা করবে। দুনিয়াবী কোনো পদ-পদবী, অর্থবিত্ত, সুনাম-সুখ্যাতি, সাথীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব, অধিক ছাত্রের সমাগম উদ্দেশ্য হবে না। হাদিয়া-তোহফা বা সেবা-খেদমত তোমার ইলমকে যেন কুলষিত না করে। অন্যথায় হাদিস-কোরআনে ভয়াবহ শাস্তির কথা উল্লেখ হয়েছে।

২. আত্মশুদ্ধি: ইলম হলো বাতেনী ইবাদত। শরীয়তের দৃশ্যমান ইবাদত যেমন দৃশ্যমান পবিত্রতা ছাড়া হয় না তেমনি অভ্যন্তরীণ ইবাদত ইলম অর্জনও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা ছাড়া হবে না। তাই তালিবুল ইলমের উচিত নিজ আত্মাকে সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ, ধোঁকা প্রতারণা, লোভ, মিথ্যা, গীবত, রিয়া, অহংকার ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখা। প্রকাশ্য ও আত্নীক রোগ থেকে নিজের অন্তরকে বাচিয়ে রাখতে হবে। আত্মাকে ইলম গ্রহণের উপযুক্ত করার জন্য ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাস ও বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত থাকতে হবে তবেই ইলমের নিগূঢ় রহস্য উন্মোচিত হবে।

৩. আমলে পাবন্দী: তালিবুল ইলমগণ কুরআন তিলাওয়াতে ও নফল ইবাদতে পাবন্দী করবে। রাতদিন নফল নামাজ, দুরূদ ইস্তিগফার ও সাপ্তাহিক-মাসিক নফল রোজা জারি

রাখবে। নিয়মিত কুরআন হাদিসে বর্ণিত দুআ পড়বে। আল্লাহর কাছে সর্বদা দুআ রোনাজারি চলমান রাখবে। জবানে ও অন্তরে সদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জিকির রাখবে।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহঃ) সবসময় আল্লাহর যিকির করতেন। হযরত বলতেন, ইস্তেঞ্জাখানায় কিভাবে যিকির করবে? সেখানে তো যিকির করা যাবে না! হযরত বলতেন, যিকরে লিসানীই না নিষেধ, যিকরে ক্বলবী তো কখনোই নিষেধ না। যেখানে মুখে আল্লাহকে ডাকা যাবে না, সেখানে মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে হবে।

৪. সদাচরণ: তালিবুল ইলম মানুষের সাথে সদাচরণ করবে। সালাম দিবে। হাসি মুখে থাকবে। রাগ গোস্সা হজম করবে। সীমাহীন রাগ একটি রূহানী রোগ। এর চিকিৎসা করতে হবে। *একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবেদন করলেন,*

أوصني يا رسول الله

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি নসীহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নসীহত করে বললেন,

لا تغضب.

রাগ ও গোস্সাকে নিয়ন্ত্রণ কর।

সাহাবী আবারও বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আরেকটি নসীহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও বললেন,

لا تغضب.

রাগ ও গোস্সা নিয়ন্ত্রণ কর। অর্থাৎ সীমাহান গোস্সা যে তোমার মধ্যে আছে, এটা ছাড়ো।সাহাবী তৃতীয় বারের মতো আবারও দরখাস্ত করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নসীহত করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবারও বললেন,

لا تغضب.

তুমি তোমার রাগ ও গোস্সা দমন কর।

فَرَدَّدَ مِرَارًا.

অর্থাৎ যতবারই সাহাবী নসীহত চাইলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবার একই কথা বললেন, গোস্সা ছাড়ো, গোস্সা ছাড়ো, গোস্সা ছাড়ো। (সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১২০)

তালিবুল ইলম মানুষকে কষ্ট দিবে না। মানুষকে আরাম পৌঁছানোর চেষ্টা করবে। তাদের প্রয়োজন মিটাবে। তাদের বোঝা বহন করবে। নিজে ভোগ না করে তাদের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে। জুলুম করবে না, বরং ইনসাফ করবে। গরীব-দুঃখীর প্রতি সদয় থাকবে। পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। সাথিদের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করবে। তাদের সাহায্য সহযোগীতা করবে। শুকরিয়া করবে।

৫. অল্পে তুষ্টি: পার্থিব অভিলাস, উচ্চাশা থেকে অন্তরকে গুটিয়ে নিলে তবেই ইলম ও হিকমতের ঝর্ণা বইবে। কঠিন দারিদ্র্যে ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাহলে ইলমে গভীরতা আসবে। তাই তালিবুল ইলম ইলম অর্জনের পথে যা আসে তাই খেয়ে সন্তুষ্ট থাকবে; অল্প হোক না কেন। পরিধানের জন্য যা পাওয়া যাবে তাই পরবে; পুরনো হোক না কেন।

৬. ইনহিমাক: তালিবুল ইলমের একটি বড় গুন হলো ইনহিমাক। তালিবুল ইলমকে সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেকে ইলমের মধ্যে; পড়াশোনার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং নিমগ্নতায় বিঘ্ন ঘটায় এমন সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। চোখ কান মুখ সব কিছু বন্ধ করে নিজেকে ইলমের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে। মাদরাসা যিন্দেগীতে তালিবুল ইলমের প্রধান ব্যস্ততা হলো নিমগ্নতার সাথে কিতাবের মধ্যে ডুবে থাকা। তালিবুল ইলমের জন্য খুব ইনহিমাক জরুরি। ইনহিমাক ছাড়া কোনো রকমের গভীর চিন্তাভাবনা বা পান্ডিত্য ও পরিপক্কতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তালিবুল ইলমদের সচেতন থাকতে হবে। এক মুহূর্তের উদাসীনতা তাদের হাজার বছরের পথ পিছিয়ে দিতে পারে। এক মুহূর্তের গাফলতি তালিবুল ইলমের বরবাদি বা বিচ্যুতির কারণ হয়ে যেতে পারে। সে জন্য সতর্কতা সব সময় জরুরি।

৭. ইনকিতা: ইলম অর্জনে মনোযোগ নষ্ট করে এমন সবকিছু থেকে তালিবুল ইলমকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। কারণ নির্জনতা ও একাকিত্ব চিন্তার সচ্ছতার পক্ষে সহায়ক। চিন্তা ফিকির সচ্ছ হলে বিষয়বস্তু সহজে আত্মস্থ হয়। ইলম তো হাসিল হয় আকলের সাহায্যে। আর আকল খুবই স্পর্শকাতর; সামান্য শোরগোলে তা ব্যহত হয়, বিগড়ে যায়। তাই বুঝা গেলো কঠিন ও সূক্ষ্ম ইলম অর্জনে স্থান-কালের গুরুত্ব অপরিসীম। এইজন্য তালিবুল ইলমের জন্য শোরগোল থেকে দূরে থাকা ভালো।

৮. ধৈর্য: ইলমের পথ সহজ নয়। এটি কষ্ট, ত্যাগ ও ধৈর্যের পথ। ধৈর্যের সাথে পরিশ্রমের সিঁড়ি না পেরিয়ে সফলতার উচ্চ শিখরে পৌঁছা যায় না। কঠিন শিখরে পৌঁছতে হয় কাঠিন্য পার করে আর সহজ স্তরে পৌঁছা যায় সহজে। যেমন: মধু পেতে হলে মৌমাছির হুল সহ্য করতেই হবে। সুতরাং তালিবুল ইলমকে ধৈর্যশীল ও অধ্যবসায়ী হতে হবে। কারণ জিহাদে সবর হয় সামান্য কিছু সময়ের জন্য কিন্তু তালিবুল ইলমকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধর ও ধৈর্যে অটল থাক এবং পাহারায় নিয়োজিত থাক। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হও। (সূরাঃ ৩/ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ২০০)

৯. তাওয়াক্কুল: তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি পরম নির্ভরতা তালিবুল ইলমের অন্যতম গুন। তাওয়াক্কুল ছাড়া মোতালায় মনোযোগ ধরে রাখা যায় না। কারণ ভবিষ্যৎ ভাবনা ও পার্থিব উন্নতির চিন্তা তালিবুল ইলমকে অস্থির করে তুলবে। অর্থ উপার্জনের কোনো কাজে লেগে গেলে আর যায় হোক ইলম অর্জন হবে না কেননা এতে গভীর মনোযোগের বিঘ্ন ঘটে। ইলম দাবী করে অখন্ড মনযোগ, নিরবিচ্ছিন্ন সাধনা। সেখানে অন্যদিকে মনযোগ দেওয়ার অবকাশ নেই। ইলমের জন্য পূর্ণ আত্মসমাহিত হয়ে সর্বস্ব বিলিন করলেও ইলম তার থেকে সামান্য কিছু ইলম দিবে। ইলম অনেক গায়রতওয়ালা।

অন্য সবার চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়া দেখে নিজের ভবিষ্যৎ তো অন্ধকার এমন চিন্তায় ডুবে গেলে ইলম অর্জন হবে না। ভবিষ্যৎ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার হাতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা নিজেই যখন ভবিষ্যতের জিম্মাদার তখন চিন্তা না করে একমাত্র আল্লাহর প্রতি একান্ত ভরসায় গভীর মোতালায় আত্মনিমগ্ন হতে হবে। ইমাম আবু হানিফা আব্দুল্লাহ বিন হাসান যুবাইদীর সূত্রে বর্ণনা করেন, যে দ্বীনের তাফাকুহ হাসিল করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তাঁর সকল দায়িত্ব নিজে নিয়ে নেন এবং তাকে অকল্পনীয়ভাবে রিজিক দেন।

৯. গুনাহমুক্ত জীবন যাপন: তালিবুল ইলমকে ছোট বড় সকল গুনাহের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গুনাহের কারণে বান্দা দ্বীনি ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। ইলম হলো নূর বা আলো যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষের অন্তরে স্থাপন করেন। আর গুনাহ হলো অন্ধকার যা ইলমের নূর বা আলোকে নিভিয়ে দেয়। ফলে ইলম ও গুনাহ একসাথে এক পাত্রে সহাবস্থান করতে পারে না। অন্যদিকে গুনাহের কারণে বান্দা রিজিক থেকে বঞ্চিত হয় আর ইলম হলো সর্বোত্তম রিজিক। সাওবান (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُه

নিশ্চয়ই কোন ব্যক্তি গুনাহ্'র কারণেই রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়''।(ইবনু মাজাহ্ হাদিস ৮৯)

১০. তাকওয়া: একজন মুমিনের অন্তরে সদা জাগ্রত থাকা উচিত যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা তার প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবগত। এ অনুভূতি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে জাগ্রত থাকা উচিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَإِيَّايَ فَارْهَبُون

'আর ভয় কেবলমাত্র আমাকেই কর। (সূরাঃ ২/ আল বাকারা, আয়াতঃ ৪০)

মুমিনের জন্য ভয় ও আশার মধ্যে ভারসাম্য রেখে রবের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين.

তারা ভয় ও আশা নিয়ে আমাকে ডাকতো এবং তারাই ছিলো আমার কাছে বিনয়ী। (সূরাঃ ২১/ আল আম্বিয়া, আয়াতঃ ৯০)

মুমিনের জন্য ভয় ও আশা এই দুইটি গুণ পাখির দুইটি ডানার মতো। একটির অভাবেও উড্ডয়ন সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার দিকে সম্পূর্ণভাবে মনোযোগী হতে হবে, যেন হৃদয় পূর্ণ হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ভালোবাসায়, জিহ্বা ভরে উঠে রবের যিকিরে। তালিবুল ইলম প্রতিটি সিজদায় যেন কাঁদতে কাঁদতে দুআ করতে থাকে, "হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য বিশুদ্ধ ইলমের দরজা খুলে দিন, আমাদের উপকারী ইলম দান করুন"। যদি তালিবুল ইলম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার প্রতি

সত্যিকারের বিশ্বস্ত হয় তবে তিনি তাওফিক দান করবেন তাকে রাব্বানী আলেমদের মর্যাদায় উন্নীত করবেন।

১১. সৎ সঙ্গ নির্বাচন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎ সঙ্গীকে আতর বিক্রেতার সাথে উপমা প্রদান করেছেন, যার কাছে মানুষ উঠাবসা করলে আতরের ঘ্রাণ পায়, যদিও সে আতর ক্রয় না করে।

আবু মুসা (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, *"সৎ সঙ্গীর উপমা হলো আতর বিক্রেতার ন্যায়; যদি তুমি তার কাছ থেকে আতর না-ও ক্রয় করো, তবুও তার কাছে থেকে সুঘ্রাণ পাবে। আর মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হলো কামারের মতো; সে যদি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মাধ্যমে তোমাকে পুড়িয়ে না-ও দেয়, তবুও তার খারাপ ধোঁয়া তোমার কাছে আসবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৬২৮)*

বন্ধু হিসেবে যিনি নেককার, ইলম অর্জনে ব্যস্ত, সদাচরণে অভ্যস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী এমন কাউকে নির্বাচন করতে হবে। যিনি আল্লাহর দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে, যখন পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে তখন দৃঢ় রাখবে। বেশি ইলম ও হিকমত অর্জনের জন্য উৎসাহিত করবে। সেই সঙ্গীর মাঝে দ্বীনদারিতা, চরিত্রে বিশ্বস্ত এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য পরামর্শদাতা, নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক হওয়ার গুণাবলী বিদ্যমান থাকবে। অন্যদিকে, অসৎ সঙ্গ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। কারণ, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি সহজেই সঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়, কখনো তা অজান্তেই ঘটে।

আবু উমামা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, *যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে। (আবু দাউদ, হাদিস ৪৬৮৩)*

১২. ইলম অর্জনে উচ্চাকাঙ্খী হওয়া: ইলম অর্জনের পথে তালিবুল ইলমের অন্তরে গভীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা আবশ্যক। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। তালিবুল ইলমের যদি অধিক জ্ঞান লাভের শারীরিক সক্ষমতা, সময়-সুযোগ ও পর্যাপ্ত আর্থিক সামর্থ্য থাকে তবে অল্পতে সন্তুষ্ট হয়ে থেমে যাওয়া অনুচিত। "পরে

শিখব” বলে ভবিষ্যতের উপর নির্ভরতার ধোঁকায় যেন তালিবুল ইলম প্রতারিত না হয়। পরবর্তী সময়ে নানান ব্যস্ততা, দায়িত্ব কিংবা শারীরিক অক্ষমতা ইলম অর্জনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই বর্তমানকেই সর্বোত্তম সময় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك

“তোমরা পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গণিমত-সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে কাজে লাগাও তোমার অসুস্থতার পূর্বে, তোমার সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও অসচ্ছলতার পূর্বে, তোমার অবসরতাকে কাজে লাগাও তোমার ব্যস্ততার পূর্বে, আর তোমার হায়াতকে কাজে লাগাও তোমার মৃত্যু আসার পূর্বে” (হাকিম, হাদিস ৭৮৪৬)।

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْهُومَانِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُومٌ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُومٌ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না। ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী। (মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩)

সুতরাং ইলমের প্রতি ভালবাসা, লোভ এবং তা অর্জনের চেষ্টা অব্যাহত থাকবে মৃত্যু পর্যন্ত।

১৩. অনর্থক লজ্জা ও অহংকার থেকে নিজেকে বিরত থাকা: লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায়। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ (রহঃ) বলেন,

لَا يَتَعَلَّمُ العِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। (সহীহ বুখারী, ১/৩৮)

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রঃ) আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন,

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না। (সহীহ বুখারী, ১/৩৮)

আর একজন মুমিন চলনে বলনে সর্বক্ষেত্রে বিনয়ী হবে। ইলম অন্বেষণের ক্ষেত্রে হতে হবে আরো বেশি বিনয়ী কেননা ইলমের ব্যাপারে অহংকার করা মানুষ ইলমের বরকত থেকে মাহরুম হয়। ইলম শিখতে হবে নিজের জিন্দেগী সাজানোর জন্য, আরেকজনের দোষ ধরার জন্য নয়। একজন ইলমওয়ালা যখন নিজের ইলম দিয়ে নিজেকে রাঙায়, নিজের দোষত্রুটি বের করে, নিজের জিন্দেগী সুন্দর করার ফিকির করে সেই হলো প্রকৃত তালিবুল ইলম। পুঁথিগত বিদ্যা যেন তালিবুল ইলমকে অহংকারী বানিয়ে না দেয়। নিজে ছোট হয়ে থাকব। অন্যদের সাথে তর্কে যাওয়া যাবে না। সবসময় মনে করবে যেন তিনি কিছুই জানে না। মূসা (আঃ) একজন নবী হয়ে তিনি যাচ্ছেন আরেকজনের কাছে শিখার জন্য। ইলমের যে সমুদ্র, যে বিশালতা সে তুলনায় মানুষ কীইবা জানে। এজন্য যা জানবে যা শিখবে তা যেন অহংকার সৃষ্টি না করে। তাই নিজেকে সবসময় মনে করিয়ে দিতে হবে "আমি কীইবা শিখছি, আরো কতইনা বাকি আছে। আরো কতকিছু শিখতে হবে।'' ইলম শিখতে শিখতে তালিবুল ইলমের মধ্যে অহংকার আসা শুরু করলে এই ইলম শেখাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল, যা তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। এজন্য তাযকিয়া ও ইসলাহের মেহনতের গুরুত্ব অনেক বেশি।

১৪. পার্থিব সম্পর্কে জড়াবে না:

ইলমের জন্য অখণ্ড মনযোগ প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে মাদরাসার সময়টুকু নির্বিঘ্নে কাটানোর জন্য আত্নীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে। একজন তালিবুল ইলম যদি মোবাইলের মাধ্যমে সারা দুনিয়ার হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার অংশীদার হতে চায়; কার বিয়ে হলো, কে কোথায় গেলো, কোথায় কোন দুর্ঘটনায় কতজন মারা গেলো; চব্বিশ ঘণ্টার আপডেট খবর যদি জানতে চায়, আর যায় হোক তার আর ইলম অর্জন হবে না। অনেকে যুক্তি দেখায় ইন্টারনেটে কতকিছু পাওয়া যায়, সেখানে জানার আছে কতকিছু! কিন্তু উস্তাদরা এই ক্ষেত্রে আগে কিতাবের পাতা থেকে ইলম উদ্ধার করতে শিখার পরামর্শ দেন। ফ্যাশনেবল জামা, লেটেস্ট মডেলের মোবাইল, নিত্য নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এসব চিন্তায় বিভোর থাকলে ইলম অর্জন হয় না।

১৫. রুটিন অনুযায়ী চলা: তালিবুল ইলমের সব কাজ রুটিন অনুযায়ী হতে হবে। খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-ঘুম, ওজু, গোসল, ইবাদত-বন্দেগী, পড়ালেখা সবই হতে হবে নিয়মমাফিক। তাহলেই সে পৌঁছতে পারবে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল

জাওযী তার বিখ্যাত কিতাব সাইদুল খাতিরে লেখেন, তালিবে ইলমের উচিত তার অধিকাংশ চেষ্টা-প্রচেষ্টা মুখস্থ ও তাকরারে ব্যয় করা। এতেই বিশেষ মনোযোগ দেয়া। আল্লামা বুরহানুদ্দীন জারজী (রহঃ) বলেন, তালিবুল ইলমের উচিত প্রতিটা মুহূর্তকে কাজে লাগানো, যাতে মর্যাদা হাসিল করতে পারে। সময় কাজে লাগানোর সহজ পদ্ধতি হলো, সবসময় নিজের সাথে কাগজ কলম রাখবে, যাতে মূল্যবান কিছু শুনলে লিখে রাখা যায়। কেননা কথায় বলে, যা মুখস্থ করা হয় ভেগে যেতে চায়, আর যা লেখা হয় তা স্থায়ী থাকে।

ইখতিলাফি বা মতভেদপূর্ণ আলোচনায় তালিবুল ইলমের করণীয়

ইখতিলাফ বা মতভেদপূর্ণ বিষয়ে সঠিক কর্মপদ্ধতি জানা তালিবুল ইলমের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব। এই আদব রক্ষা করতে না পারলে অন্যান্য আদবগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে।

যেসকল বিষয়ে মতভেদ হবে: যে বিষয়ে মতভেদ করার সুযোগ রয়েছে কেবল সে বিষয়ে মতভেদ করা বৈধ। এই বিষয়গুলোকে মুজতাহাদ ফিহি বলা হয়। যেকোনো বিষয়ে যে কেউ একাধিক মত দিলেই সেটা গ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে না। তাই কোন কোন বিষয়ে মতভেদ করা যাবে এটি জানতে হলে আগে ২টি বিষয় জানা প্রয়োজন।

১. قطعي - কত্বয়ী।

২. ظني - জন্নি।

১. কত্বয়ী: এটি অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত, যার কোনো ব্যাখ্যার সুযোগ নেই।

২. জন্নি: যার একাধিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব। নির্ভরযোগ্যতা ও অর্থ যাচাই-বাছাই করা সম্ভব যে এটার সত্যতা কতটুকু, সহীহ না জঈফ।

কত্বয়ী এবং জানা জন্নি মোট ৪ প্রকার:

১. "নির্ভরযোগ্যতা ও অর্থ" উভয়টা ও কত্বয়ী হলে তখন ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। এই বিষয়গুলো নিয়ে ওলামাগণের মধ্যে অমিল থাকতে পারবে না। যেমন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার একত্বে শরীফ নিষিদ্ধ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রিসালাত-নবুয়ত, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ, মদ-সুদ হারাম হওয়া ইত্যাদি। যে কেউ এই কত্বয়ী ধরনের নির্ভরযোগ্য বিষয়ে দ্বিমত পোষন করলে বুঝতে হবে সে গোমরাহির পথে হাঁটছে।

২. নির্ভরযোগ্যতা কত্বয়ী কিন্তু অর্থ ও ব্যাখ্যা জন্নি হলে এখানে ইখতিলাফের সুযোগ রয়েছে। যেমন: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖ

আর তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন কুরু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে। (সূরাঃ ২/ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২২৮)

এখানে কুরু বলতে হানাফী ওলামায়ে কেরাম বলছেন, কুরু অর্থ হায়েজ। অর্থাৎ তিনটি পূর্ণহায়েজ অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে। পক্ষান্তরে শাফেয়ী ওলামায়ে কেরাম বলছেন, তিনটি পবিত্রকাল পুরোপুরি শেষ হওয়ার পর পর্যন্ত তারা ইদ্দতকাল পূর্ণ করবে। এখানে কুরু বলতে তিনটা হায়েজ নাকি তিনটা পবিত্রকাল বোঝাচ্ছে এটা নিয়ে কোনো কত্বয়ী বা অকাট্য দলিল কুরআন হাদিসের অন্যকোন জায়গায় বা আরবি ভাষার প্রচলিত নিয়মে বা কোন হাদিসের মধ্যে স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই বিষয়ে ব্যাখ্যার সুযোগ রয়েছে।

এজন্য এখানে যেহেতু কুরআন মাজীদের আয়াত রয়েছে তাই এর নির্ভরযোগ্যতা কত্বয়ী হয়ে গেল। কিন্তু এর ব্যাখার বিষয়টা হয়ে গেল জন্নী। সুতরাং এখানে একটা মতভেদ হয়ে গিয়েছে এবং এটি একটি বৈধ মতভেদ।

৩. নির্ভরযোগ্যতা জন্নি কিন্তু অর্থ কত্বয়ী, এখানেও ইখতিলাফের সুযোগ রয়েছে।

৪. নির্ভরযোগ্যতা এবং অর্থ উভয়টা জন্নি, এখানেও ইখতিলাফের সুযোগ রয়েছে।

মূল কথা হলো, জন্নি বিষয় নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতভেদ হয়ে থাকে এবং শরীয়তের মধ্যে অসংখ্য-অগণিত জন্নি বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। যেমন: নামাজে কোথায় হাত বাঁধা হবে, কেউ বলেছে বুকের উপর, কেউ বলেছে নাভি বরাবর, কেউ বলেছে নাভির উপরে, কেউ বলেছে নাভির নিচে। রমাদানের মাস শুরুর হিসাবটা কিভাবে হবে অর্থাৎ

কতজনের চাঁদ দেখাটা এখানে নিয়ম হবে। তারাবীর নামাজ আসলে কত রাকাআত। দাঁড়ি কতটুকু লম্বা হবে, এটা কি একমুষ্টি রেখে দেয়া যথেষ্ট নাকি পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হবে। এমন আরো অনেক বিষয় নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ বা ইখতিলাফ আছে যা জন্নি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

এক্ষেত্রে তালিবুল ইলমের করণীয়: ইখতিলাফের বিষয়টি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। সাহবায়ে কেরামদের যামানা থেকেই মতভেদ হয়ে আসছে। তাই মতভেদপূর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে তালিবুল ইলমের অন্তর প্রসারিত করতে হবে। যে সকল বিষয়ে ইখতিলাফের সুযোগ রয়েছে সে সকল বিষয়ের ক্ষেত্রে মতানৈক্যের কারণে অন্যদের ব্যাপারে কটুক্তি, শত্রুতা, হিংসা করা উচিত নয়। তালিবুল ইলমের জন্য আবশ্যক হলো, তারা মতভেদের কারণে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও শত্রুতার পথ বানাবে না। পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরামগণ মতভেদগুলো নিয়ে পরস্পরের সাথে হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করেননি বরং ইলমের প্রতিটি শাখায় বড় বড় খিদমতের মাধ্যমে শত শত বিষয়ে সহবস্থান করেছেন। বর্তমানে ইখতিলাফি বিষয়গুলো কিভাবে গ্রহণ করতে হবে সেটিই জানেনা ফলে ইখতিলাফি বিষয়কে দ্বীন ধ্বংসের কারণ মনে করা হয়। কিন্তু ইখতিলাফ গুলোকে নতুন ফিতনা, ষড়যন্ত্র বা দ্বীন ধ্বংসের কারণ, এমন মানসিকতা লালন করা উচিত নয়। কোনো বিষয়ে নিজেদের উস্তাদ বা শাইখ আলোচনা করেননি বা বলেননি বলে তারা নিজেদের জানার বাইরে সেই বিষয়ে অন্য কারো মতামত গ্রহণ করতে চায় না, অনেক দ্বীধা কাজ করে। এক্ষেত্রে এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, নিজেদের উস্তাদ বলেননি বলে তার মানে এই নয় যে এই মতের কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই গাইরে আলেম বা সাধারণ মানুষকে এই ইখতিলাফি বিষয়গুলোকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে হবে, বাড়াবাড়ি করা যাবে না। বর্তমানে বিভিন্ন ঘরানার ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক ওলামা আছেন, যারা সত্যিকার অর্থে অনেক গভীর জ্ঞান রাখেন, তবে দুঃখের বিষয় যে, প্রত্যেক ঘরানার মধ্যে কেউ কেউ এমন মনে করেন যে, তার মাযহাবের অনুসরণ না করলে গোমড়া হয়ে যাবে বা তাদের মতের বাইরে যাওয়া যাবেনা! প্রকৃতপক্ষে তারাও নিজ নিজ নির্ভরযোগ্য ওলামায়ে কেরামদের অনুসরণ করছে তাই এখানে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি বা বিদ্বেষ পোষণ কোনটাই উচিত নয়। অথচ এই মুসলিম উম্মাহর মাঝে ইখতিলাফি বিষয় নিয়ে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব লেগে থাকে ফলে মুসলিমদের শত্রুরা খুশি

হয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَ اَطِیۡعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوۡلَهٗ وَ لَا تَنَازَعُوۡا فَتَفۡشَلُوۡا وَ تَذۡهَبَ رِیۡحُکُمۡ وَ اصۡبِرُوۡا ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیۡنَ

আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরাঃ ৮/ আল-আনফাল, আয়াতঃ ৪৮)

সাহাবাহগণ এ ধরনের মাসআলায় মতানৈক্য করতেন। কিন্তু তারা এক হৃদয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং ভালোবাসা ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।

তাই মনে রাখতে হবে, উসূলে ফিক্বহে অনেক ভাগ রয়েছে; যেগুলো থেকে একেক জন ওলামায়ে কেরাম একেক রকম মতামত দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। একই দলীল কারো কাছে সহীহ, আবার কারো কাছে কিনায়াহ। একই দলীল কেউ বলছেন হাক্বীকি অর্থে, কেউ বলছেন মাযাজ অর্থে। তাই প্রত্যেকের উচিত উসূলুল ফিক্বহের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা, যাতে করে বুঝতে পারা যায় যে কেন মতভেদগুলো রয়েছে এবং মতভেদগুলো গ্রহণ করবে কিভাবে তার মানসিকতা তৈরী করতে হবে।

ইলম ও আমল

ইলম ও আমল একে অপরের পরিপূরক। কোনো ইবাদত, আমল শুরু করার আগে সেই আমল সম্পর্কে ইলম অর্জন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইলম ব্যতীত আমল এবং আমল ব্যতীত ইলম কোনোটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। আমল কবুলযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো তা একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার জন্য হতে হবে এবং শরীয়াহ অনুমোদিত পদ্ধতিতে আদায় করতে হবে। কিন্তু সঠিক ইলম না থাকলে মানুষ তাওহীদ মনে করে শিরক করে ফেলতে পারে আবার সুন্নাহ মনে করে বিদআত করে ফেলতে পারে। সেজন্য আবুল হাসান আল-হার্রালী বলেন,

العمل ما دبر بالعلم

"প্রকৃত আমল সেটাই যা জ্ঞান অনুযায়ী সম্পাদন করা হয়''। (আবুল হাসান আল-হার্রালী, তুরাছু আবিল হাসান আল-হার্রালী (মরক্কো : মানশুরাতুল মারকায আল-জামে'ঈ, ১ম প্রকশ, ১৪১৮হি./১৯৯৭খৃ.) পৃ. ২৩২) অর্থাৎ শুধু জ্ঞান অর্জন করলেই আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা হয় না; বরং সেই জ্ঞান অনুযায়ী যখন আমল করতে হবে, তবেই সেই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান হিসাবে আখ্যায়িত হয়। যেমন: শুধু অন্তরে বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি দিলে ঈমানদার হওয়া যায় না; বরং তার সাথে আমল করার মাধ্যমে সেই বিশ্বাস ও স্বীকৃতির দাবী বাস্তবায়ন করতে হয়। ক্বিয়ামতের ময়দানে এ ব্যাপারে প্রত্যেক বান্দাকে জিজ্ঞেস করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ'

ক্বিয়ামত দিন আদম সন্তানের পা আল্লাহর কাছ থেকে একটুও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে : (১) তার জীবনকাল সম্পর্কে, তা কোন পথে অতিবাহিত করেছে, (২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা জীর্ণ করেছে, (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে, (৪) আর তা কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে অনুযায়ী কী আমল করেছে'। (তিরমিযী, হাদিস২৪১৬; মিশকাত হাদিস, ৫১৯৭)

সালাফগণ বলতেন,

الْعِلْمُ إِمَامٌ وَالْعَمَلُ تَابِعُهُ، يُلْهَمُهُ السُّعَدَاءُ، وَيُحْرَمُهُ الْأَشْقِيَاءُ

'জ্ঞান হলো আমলের নেতা, আর আমল হলো জ্ঞানের অনুসারী। সৌভাগ্যবানদেরকে এটা প্রদান করা হয়, আর হতভাগাদের তা থেকে বঞ্চিত করা হয়'। (ইবনু আজীবাহ, আল-বাহরুল মাদীদ ১/৩৩৩)।

ইলম হলো মানব জীবনের আলোকবর্তিকা স্বরূপ, যা অন্তরকে জাগ্রত করে, ঈমানকে শাণিত করে, উপকারী চিন্তার উন্মেষ ঘটায়, আমলকে সঠিক ও পরিশুদ্ধ করে এবং জীবনকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদা নির্ধারিত হয় তার আমলের মাধ্যমে; বাহ্যিক বেশ-ভূষা, চেহার-ছূরাত ও ধন-দৌলতের মাধ্যমে নয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) এর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেন না; বরং তিনি তোমাদে অন্তর ও আমল সমূহের প্রতি দৃষ্টি দেন''। (মুসলিম হাদিস ২৫৬৪; মিশকাত হাদিস ৫৩১৪)।

আমলই হচ্ছে ইলমের পূর্ণতা ও ঈমানের বাস্তব প্রতিফলন। ইলম যদি হয় আলো, তবে আমল হলো জীবনকে আলোকিত করার বাস্তব প্রতিফলন। আমল শুধু ধর্মীয় আচরণ নয় বরং তা জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার একটি বহুমাত্রিক প্রয়াস। তাই প্রকৃত সফলতা ও চিরস্থায়ী মুক্তির জন্য ইলমের সাথে আমলের সমন্বয় অপরিহার্য। বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ব্যক্তিগত জীবন থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গন পর্যন্ত প্রতিনিয়ত অশান্তি, যাবতীয় বিশৃঙ্খলা, দুর্গতির পিছনে অন্যতম কারণ হলো ইলম ও আমলের মাঝে সমন্বয়হীনতা। যা শিখে এবং বলে তা নিজে আমলে বাস্তবায়ন করে না, ফলে দিন শেষে নিজের নেক আমলের পাল্লাটা শূন্যই পড়ে থাকে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লাও রাগান্বিত হন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ □

তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর নিকট বড়ই ক্রোধের বিষয়। (সূরাঃ ৬১/ আস-সফ, আয়াতঃ ৩)। আয়াতে উল্লিখিত مَقْتًا শব্দটি সাধারণ অসন্তুষ্টির চেয়েও তীব্র ঘৃণাকে বোঝায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা অন্যত্র বলেছেন,

اَتَاۡمُرُوۡنَ النَّاسَ بِالۡبِرِّ وَ تَنۡسَوۡنَ اَنۡفُسَکُمۡ وَ اَنۡتُمۡ تَتۡلُوۡنَ الۡکِتٰبَ ؕ اَفَلَا تَعۡقِلُوۡنَ□

তোমরা কি মানুষকে ভালো কাজের আদেশ দিচ্ছো আর নিজেদেরকে ভুলে যাচ্ছো? অথচ তোমরা কিতাব তিলাওয়াত কর। তোমরা কি বুঝ না? (সূরাঃ ২/ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৪৪)। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম নিচের হাদিসটি উল্লেখ করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, *মিরাজের রাতে আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলামঃ হে জিবরীল! এরা কারা? জিবরীল (আঃ) বললেন, এরা আপনার উম্মাতের এমন বক্তাগণ, যারা লোকেদেরকে ভালো কাজের আদেশ করতো কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেত। অর্থাৎ- নিজেরা সৎকাজ করতো না। অথচ তারা কিতাব অধ্যয়ন করতো, তবুও কি তারা বুঝতো না? (ইবনে হিব্বান, হাদিস ৫৩)।* স্বর্ণালী যুগের সোনালী মানব সালাফে সালেহীনদের জীবনি থেকে বুঝা যায় যে, উনারা অর্জিত জ্ঞান বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার যথাসাধ্য চেষ্টার মাধ্যমে ইলম ও আমলের সমন্বয় করতেন।

আলী ইবনু আবী তালেব (রঃ) বলেন,

يَا حَمَلَةَ الْعِلْمِ، اعْمَلُوا بِهِ؛ فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَلِمَ ثُمَّ عَمِلَ وَوَافَقَ عَمَلُهُ عِلْمَهُ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَحْمِلُونَ الْعِلْمَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ تُخَالِفُ سَرِيرَتُهُمْ عَلَانِيَتَهُمْ وَيُخَالِفُ عَمَلُهُمْ عِلْمَهُمْ، يَقْعُدُونَ حَلَقًا فَيُبَاهِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى غَيْرِهِ وَيَدَعَهُ، أُولَئِكَ لَا تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ تِلْكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَل□□

"‘হে জ্ঞানধারীরা! তোমরা তোমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করো। কারণ প্রকৃত আলেম তো সেই ব্যক্তি, যে জ্ঞান অর্জন করে এবং সে অনুযায়ী আমল করে এবং যার আমল তার জ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আগামীতে এমন কিছু লোক আসবে, যারা জ্ঞান বহন করবে, কিন্তু সেই জ্ঞান তাদের গলার নীচে নামবে না (অন্তরে প্রবেশ করবে না, প্রভাব ফেলবে না)। তাদের অন্তরের অবস্থা ও বাহ্যিক প্রকাশ পরস্পর বিরোধী হবে। তাদের আমলও তাদের জ্ঞানের বিরোধিতা করবে। তারা বৈঠকে বসবে এবং একে অপরের সামনে নিজেদের জ্ঞান নিয়ে গর্ব করবে। এমনকি একজন ব্যক্তি তার সাথীর ওপর রাগান্বিত হবে শুধু এই কারণে যে, সে গিয়ে অন্য কারো পাশে বসেছে এবং তাকে (আগের জনকে) ছেড়ে দিয়েছে। এমন লোকদের কোন আমলই তাদের ঐসব বৈঠক থেকে আল্লাহর কাছে উঠবে না (কবুল হবে না)''। (ইবনু আব্দিল বার্র, জামে‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১৪১৪হি.) ১/৬৯৭; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব (বৈরূত : দারুল ফিক্র, ১৪১৫ হি.) ৪২/৫০৯)। আলী (রঃ) এর এই বক্তব্যটি বর্তমান সময়ের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি। বর্তমানে অনেকেই নানা রকম বিষয়ে ইসলামী জ্ঞান অর্জন করে এবং নানান পদ্ধতিতে অন্যদের উপদেশ দিচ্ছে কিন্তু তাদের সেই জ্ঞান নিজের জীবনে প্রভাব ফেলে না। তাদের অবস্থাও যেন ইলম গলার নিচে নামে না, অন্তরে প্রবেশ করে না। সকলে ইলমের আলোচনায় ব্যস্ত, কিন্তু নিজের জীবনে সেই ইলমের বাস্তব অনুশীলন অনুপস্থিত। আজকের সমাজে এটি খুবই পরিচিত দৃশ্য। এই অবস্থা না বদলালে জ্ঞান শুধু পুঁথিগতই থেকে যাবে যা কিয়ামতের দিন বিপদের কারণ হবে। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন,

ويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرّةً، وويل لمن علم ولم يعمل سبعين مرَّة□□

‘যে জানেনি এবং আমল করেনি, তার জন্য একবার আফসোস। আর যে জেনেছে কিন্তু আমল করেনি তার জন্য সত্তর বার আফসোস’। (ইবনুল জাওযী, ছায়দুল খাত্বের, পৃঃ ৫৭)।

কিছু ব্যক্তি সঠিক ইলম অর্জন না করে, শরীয়াহ অনুযায়ী আমলের সঠিক নিয়ম না জেনে শুধু মাত্র আমলে মনোযোগ দেয় ফলে তাদের আমল হয় অন্ধ অনুসরণ ও বিদআতে পূর্ণ যা মানুষকে ভূল পথে নিয়ে যায়। অন্যদিকে কেউ কেউ শুধু মাত্র জ্ঞান

অর্জনেই ব্যস্ত কিন্তু নিজের আমলের ব্যাপারে গাফেল ফলে ইলম চর্চা তাদেরকে প্রশান্তি এনে দিতে পারে না বরং এই জ্ঞানের কারণে তারা অহংকারে পড়ে যায়। হাসান বাছরী (রহঃ) বলেন,

أَطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، وَأَطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا يَضُرُّ بِالْعِلْمِ، فَإِنَّ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ مَا يُفْسِدُ أَكْثَرَ مِمَّا يُصْلِحُ

'আমি এমনভাবে ইলম অন্বেষণ করি, যা ইবাদতের জন্য ক্ষতিকর হবে না। আর আমি এমন এমনভাবে ইবাদত করি, যা ইলম অন্বেষণের জন্য ক্ষতিকর হবে না। কেননা যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করে সে যতটা না সংশোধন করে তার চেয়ে বেশী অনিষ্ট করে'। (মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ৭/১৮৭; যামাখশারী, রাবীউল আবরার ৪/৩২)

খত্বীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন,

فَلَا تَأْنَسْ بِالْعَمَلِ مَا دُمْتَ مُسْتَوْحِشًا مِنَ الْعِلْمِ، وَلَا تَأْنَسْ بِالْعِلْمِ مَا كُنْتَ مُقَصِّرًا فِي الْعَمَلِ وَلَكِنِ اجْمَعْ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ قَلَّ نَصِيبُكَ مِنْهُمَا، وَمَا شَيْءٌ أَضْعَفُ مِنْ عَالِمٍ تَرَكَ النَّاسُ عِلْمَهُ لِفَسَادِ طَرِيقَتِهِ، وَجَاهِلٍ أَخَذَ النَّاسُ بِجَهْلِهِ لِنَظَرِهِمْ إِلَى عِبَادَتِهِ'

তুমি যতক্ষণ ইলম থেকে বিমুখ থাকবে, ততক্ষণ তুমি আমল করে তৃপ্তি পাবে না। অনুরূপভাবে তুমি যদি আমলে শীথিলতা প্রদর্শন কর, তবে তুমি ইলম অর্জন করে তৃপ্তি পাবে না। সুতরাং তুমি উভয়ের মাঝে সমন্বয় কর। যদিও ইলম-আমল উভয়ের মাঝে তোমার সামান্য কিছু অংশ থাকে'। (খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল-আমল, মুহাক্কিক্ব : মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৮৪ পৃঃ ১৪)

আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, *'নিঃসন্দেহে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হলো ইলম। আল্লাহর ফরজকৃত বিধানের প্রতিপালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জনের প্রধান মাধ্যম এটাই আল্লাহ যাকে তাওফীক্ব দান করেন তার জ্ঞানের ফলাফল হলো তার আমল। এটা প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের সংকল্পকে সুনিশ্চিত করে। ইলমবিহীন ঈমান, আমল, সংগ্রাম ও জিহাদের কোন গুরুত্ব নেই। ইলমবিহীন কথা ও কাজের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান বিহীন কোন কিছুতে উপকারিতা তো নেই; বরং রয়েছে মারাত্মক ক্ষতি, যা বড় ফাসাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়'। (ইবনে বায, মাজমূ'উ ফাতাওয়া, ৪/৫৯)*। অতএব ইলম হাসিলের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টির জন্য সার্বিক জীবনে সেই ইলমের বাস্তবায়ন। এছাড়া সেই ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক লাভ করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) বলেন,

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِلْعَمَلِ وَفَّقَه الله وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ يَزْدَادُ بِالْعِلْمِ فَخْرًا
'যে ব্যক্তি আমল করার জন্য জ্ঞান অন্বেষণ করে, আল্লাহ তাকে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দান করেন। আর যে ব্যক্তি আমল করার উদ্দেশ্য ব্যতিরেখে অন্য কোন কারণে ইলম তালাশ করে, সেই জ্ঞানের মাধ্যমে তার অহংকার বৃদ্ধি পায়'। (আবূ নু'আইম আছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ২/৩৭৮)।

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, *এমন কত আলেম আছে, আল্লাহ যাকে তার অর্জিত ইলমের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফীক্ব দেননি, ফলে স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী সে আমল করতে পারেনি। আবার এমন কত সাধারণ লোক আছে, আল্লাহ যাকে নেক আমল করার তাওফীক্ব দিয়ে সম্মানিত করেছেন। (মুহাম্মাদ খাদেমী, বারীক্বাহ মাহমূদিয়্যাহ (দামেশক : মাত্ববা'আতুল হালাবী, ১৩৪৮হি.), ১/২৯৯)।* সুতরাং ইলমের বাস্তবায়ন যার জীবনে যতো বেশী সে ততই আল্লাহমুখী ও কল্যাণকামী মানুষে পরিণত হয়।আর যার ইলম ও আমলের মাঝে সম্বনয় নেই সে নিজে যেমন ধ্বংসের মুখে পতিত হয় তেমনি সমাজও তার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এইজন্য সাধারণ পাপীর চেয়ে একজন আমলহীন জ্ঞানীর পাপ অনেক বেশী ভয়ংকর ও ক্ষতিকর। এজন্য সালাফগণ পাপী আলেম ও ক্বারীদের সবচেয়ে বেশী ভয় করতেন। তাবেঈ আইয়ূব আস-সাখতিয়ানী বলেন,

لَا خَبِيثَ أَخْبَثُ مِنْ قَارِئٍ فَاجِرٍ
পাপাচারে লিপ্ত ক্বারী (কুরআনের বাহক ও পাঠক)-এর চেয়ে দুষ্কৃতিকারী আর কেউ নেই'। (আবূ হাতেম রাযী, আয-যুহদ (রিয়াদ, সঊদী আরব : দারু আত্বলাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.) পৃ. ৫৫)।

মালেক ইবনে দীনার বলেন,

لَأَنَا لِلْقَارِئِ الْفَاجِرِ أَخْوَفُ مِنِّي مِنَ الْفَاجِرِ الْمُبْرِزِ بِفُجُورِهِ، إِنَّ هَذَا أَبْعَدُهُمَا غَوْرًا
'আমি প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তির চেয়ে বেশী ভয় করি পাপীকে। কেননা গুনাহগার ক্বারী অধিক ক্ষতিকর'।(আবূ হাতেম রাযী, আয-যুহদ (রিয়াদ, সঊদী আরব : দারু আত্বলাস, ১ম প্রকাশ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.)পৃ.৫৫)। এর একটি কারণ হলো সাধারণ পাপী তার পাপের কারণে লজ্জিত থাকে, কিন্তু আমলহীন ক্বারী তার জ্ঞানের অহংকারে এমনভাবে ডুবে থাকে যে, সে তার পাপকে তুচ্ছ ভাবতে শুরু করে। আবার একজন জ্ঞানীর পদস্খলন বহু মানুষকে দ্বীন থেকে বিমুখ করে দেয়। মানুষ তার জ্ঞানের মুখোশের আড়ালে থাকা পাপাচার দেখে হতাশ হয় এবং অনেক সময় মূল দ্বীনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে। সেজন্য একজন আমলহীন জ্ঞানী সমাজের জন্য এক নীরব ঘাতক, যে

জ্ঞানের আলো ছড়ানোর নামে অজ্ঞতা ও পাপাচারের অন্ধকার বিস্তার করে। তাছাড়া আমলের চেয়ে তর্কের প্রাধান্য বেড়ে যাওয়া কোনো ব্যক্তি বা সমাজের ওপর থেকে রহমত উঠে যাওয়ার স্পষ্ট লক্ষণ। মা‘রূফ আল-কারখী বলেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَتْحَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابَ الْجَدَلِ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ شَرًّا أَغْلَقَ عَلَيْهِ بَابَ الْعَمَلِ، وَفَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْجَدَلِ□□

‘যখন আল্লাহ কোন বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা উন্মুক্ত করে দেন এবং তার জন্য তর্ক-বিতর্কের দুয়ার বন্ধ করে দেন। আর যখন তিনি কোন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তার জন্য আমলের দরজা বন্ধ করে দেন এবং তর্ক-বিতর্কের দরজা উন্মুক্ত করে দেন’। (আবূ নু‘আইম আস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৬১)। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে সালাফদের হলো এই কথার বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়। আমল হলো আলেমের কথার প্রাণ। একজন আমলকারী আলেমের মুখ থেকে নিঃসৃত সাধারণ কথাও মানুষের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে। অন্যদিকে আমলহীন আলেমের কথায় কোনো আধ্যাত্মিকার প্রভাব বা নূর থাকে না। ফলে মানুষ তার দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রভাবিত হলেও আত্মিকভাবে উপকৃত হয় না। মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) এ অবস্থাকে একটি চমৎকার উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। *তিনি বলেন,*

إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزَلُّ الْقَطْرُ عَنِ الصَّفَا

‘যখন আলেম তার ইলম অনুযায়ী আমল করে না তখন তার উপদেশ মানুষের অন্তর থেকে পিছলে যায়, যেভাবে মসৃণ পাথরের ওপর থেকে বৃষ্টি ফোঁটা পিছলে পড়ে’। (আহমাদ ইবনে হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাশিয়া: মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম শাহীন (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, প্রথম মুদ্রণ, ১৯৯৯খৃ.),পৃ:২৬২; ইবনুল জাওযী, ছিফাতুছ ছাফওয়া,তাহক্বীক: আহমাদ ইবনে আলী (কায়রো: দারুল হাদীছ, ২০০০খ্রিঃ),২/১৬৭)।
আমলহীন আলেমের চূড়ান্ত পরিণতি ভীষণ ভয়াবহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ، كَمَثَلِ السِّرَاجِ يُضِيءُ لِلنَّاسِ وَيَحْرَقُ نَفْسَه□

‘যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণ শিক্ষা দেয়, কিন্তু নিজেকে ভুলে যায়, তার উদাহরণ হলো সেই প্রদীপের মতো, যা অন্যকে আলো দেয়, কিন্তু নিজেকে পুড়িয়ে ফেলে’। (ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/১৩১; সনদ হাসান)।

একজন আলেম বা দাই, যার কথায় প্রভাবিত হয়ে শত শত মানুষ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নৈকট্য লাভ করেছে, অথচ কিয়ামতের দিন দেখা যাবে সেই আলেম

নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত। তার জ্ঞান, অন্যদের জন্য আলো হলেও নিজের জন্য হয়েছে আগুন। আমলহীন জ্ঞানী ব্যক্তি শুধু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার কাছেই নয়, মানুষের কাছেও গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মানুষ এমন নেতা বা আলেমেকে অনুসরণ করতে চায় যার কথা ও কাজের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী বলেন,

لَا يُوَثَّقُ لِلنَّاسِ عَمَلُ عَامِلٍ لَا يَعْلَمُ، وَلَا يُرْضَى بِقَوْلِ عَالِمٍ لَا يَعْمَلُ

'মানুষের কাছে এমন আমলকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হয় না, যে আমল করে না। অনুরূপভাবে আমলহীন আলেমের কথার উপরেও মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে না'। (ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক: আমর আল-আমরী (বৈরূত: দারুল ফিক্র, ১৪১৫হি./১৯৯৫খৃ.)৪৯/২১৬)। শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, আমলও করতে হবে। আবার শুধু আমল করলেও চলবে না, সেটা হতে হবে সঠিক জ্ঞানভিত্তিক। যে ব্যক্তি ইলম ও আমলের সম্বনয় করে না তিনি হিদায়াতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَار

যাদের উপর তাওরাতের দায়িত্বভার দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি (অর্থাৎ তারা তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেনি) তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধার মত, যে বহু কিতাবের বোঝা বহন করে (কিন্তু তা বুঝে না)। (সূরাঃ ৬২/ আল-জুমু'আ, আয়াতঃ ৫) অত্র আয়াতটি ইহুদীদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে কিন্তু এই আয়াতে বর্তমান সমাজের মুসলিমদের এক অদ্ভুত চিত্রায়ণ দেখা যায়। সমাজে এমন অসংখ্য নারী-পুরুষ আছে যারা দ্বীনের অসংখ্য বিধিবিধান জেনেও নিজেদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করে না। গাধা যেমন তার পিঠের ওপর রাখা বইয়ের ভার অনুভব করে কিন্তু বইয়ের ভেতরের জ্ঞান থেকে সে চিরকাল বঞ্চিত তেমনি এই আমলহীন জ্ঞানীরাও কেবল তথ্যের বোঝা বহন করে বেড়ায়, হেদায়াতের নূর তাদের হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছায় না। ইলম এমন এক জীবন্ত সত্তার মতো যার, প্রায় হলো আমল। ইলমকে আমলের মাধ্যমে যত্ন নিলে তবেই ইলম ব্যক্তি জীবনকে আলোকিত করে। অন্যথা ইলম অভিমানী অতিথির মতো বিদায় নেয়। এজন্য সুফিয়ান ছাওরী বলেন,

يَهْتِفُ الْعِلْمُ بِالْعَمَلِ، فَإِنْ أَجَابَهُ حَلَّ وَإِلَّا ارْتَحَل

'ইলম আমলকে কানে কানে আহবান জানায়। আমল যদি তার ডাকে সাড়া দেয়, তবে সে উপস্থিত থাকে, অন্যথা সে (ব্যক্তির কাছ থেকে) প্রস্থান করে'। (ইবুল ক্বাইয়িম, মিফতাহু দারিস সা'আদাত (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ১/১০০; ইবনু

কুতাইবা আদ্দীনওয়ারী, উয়ূনুল আখবার (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪১৮হি.),২/১৪০)।

আমলের অভাবে একজন ব্যক্তির জীবন থেকে ইলমের প্রস্থান নানা ভাবে হতে পারে। যেমন: স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া, আমলের তাওফীক কেড়ে নেওয়া, ইলমের নূর ও আধ্যাত্মিক প্রভাব জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে। ইলমের নূর ও আধ্যাত্মিক প্রভাবের যে এক অনির্বচনীয় প্রশান্তি, এই অনুভূতি কেবল ইলম অনুযায়ী আমলকারী ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে এবং তিনি তাকওয়ার ময়দানে বিচরণ করতে পারে। যার ইলম তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ভয়ে ভীত করতে পারে না। সে ইলমের প্রকৃত স্বাদ থেকে বঞ্চিত। তেমনি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ থেকেও বঞ্চিত হয়। ইয়াহ্ইয়া ইবনে মু'আয আর-রাযী বলেন,

مِسْكِينٌ مَنْ كَانَ عِلْمُهُ حَجِيجُهُ، وَلِسَانُهُ خَصِيمُهُ، وَفَهْمُهُ الْقَاطِعُ بِعُذْرِهِ

'সেই ব্যক্তি কতই না দুর্ভাগা, যার জ্ঞানই (কিয়ামতের দিন) তার বিপক্ষে বিতর্ককারী হবে, যার জিহবা তার প্রতিপক্ষ হবে এবং যার বোধশক্তিই তার (আমল না করার) পক্ষে চূড়ান্ত অজুহাত পেশকারী হবে'।(খতীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমি আল আমল, পৃ. ৫৩)।

জুনাইদ ইবনে মুহাম্মাদ বাগদাদী বলেন,

مَتَى أَرَدْتَ أَنْ تَشَرَّفَ بِالْعِلْمِ وَتُنْسَبَ إِلَيْهِ، وَتَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ تُعْطِيَ الْعِلْمَ مَالَهُ عَلَيْكَ، احْتَجَبَ عَنْكَ نُورُهُ وَبَقِيَ عَلَيْكَ وَسْمُهُ وَظُهُورُهُ، ذَلِكَ الْعِلْمُ عَلَيْكَ لَا لَكَ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعِلْمَ يُشِيرُ إِلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَإِذَا لَمْ يُسْتَعْمَلِ الْعِلْمُ فِي مَرَاتِبِهِ رَحَلَتْ بَرَكَاتُه

'যখন তুমি ইলমের ওপর তোমার যে হক রয়েছে তা আদায় করার আগেই ইলমের মাধ্যমে সম্মানিত হতে চাইবে, এর সাথে সম্পর্কিত হতে চাইবে এবং এর ধারক-বাহক হিসাবে পরিচিত হতে চাইবে, তখন ইলমের নূর তোমার থেকে আড়ালে চলে যাবে এবং তোমার ওপর কেবল তার বাহ্যিক রূপ ও প্রকাশই অবশিষ্ট থাকবে (যেমন সার্টিফিকেট, লক্বব, উপাধি, মানুষের প্রশংসা)। সেই ইলম তোমার পক্ষে না হয়ে, তোমার বিপক্ষের দলীল হবে। কারণ ইলম তো তার ওপর আমল করার দিকেই ইঙ্গিত করে। যখন তুমি ইলমের বিভিন্ন স্তরে আমল করবে না, তখন তার বরকতসমূহ চলে যাবে'। (আবূ নু'আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১৩/২৬৯)।

কোনো ব্যক্তি যদি বিতর্কে জেতার জন্য মাসআলা শিখে, কুরআনের আয়াত ও হাদীস মুখস্থ করে মানুষকে চমকে দেওয়ার জন্য তখন ইলমের হক আদায় করা হয় না ফলে

মুখস্তের ভান্ডার বাড়তে থাকে কিন্তু অন্তরের অন্ধকার দূর হয় না। এমন ইলম জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়ে যায়। কা‘ব ইবনে মালেক (রঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ العُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

‘যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে তর্ক বাহাছ করা অথবা জাহেল-মূর্খদের সাথে বাকবিতন্ডা করার জন্য এবং মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণ করেছে, আল্লাহ তা‘আলা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন’। (তিরমিযী, হাদিস ২৬৫৪; ছহীহুত তারগীব, হাদিস ১০৬)। তাই একজন অলিবুল ইলমের নিয়ত থাকবে ইলম ও আমলের সমন্বয়ের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার সন্তুষ্টি অর্জন করে দুনিয়া ও আখিরাত সমৃদ্ধ করা।

বয়স্কদের ইলম অর্জন

বয়স অনেক হয়ে যাওয়ার পর ইলম অর্জন করা অনেক বড় বিষয়। এর জন্য প্রয়োজন হিম্মত ও শেখার আগ্রহ। বয়স্করা সাধারণত বিভিন্ন পেশা, সাংসারিক কর্মে আপন স্থানে ব্যস্ত। এমন ব্যস্ততার মধ্য দিয়েও ইলমের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার বিশেষ দয়া। বলা যায় তাদের বয়স তাদের ইলম অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। সাধারণ তালিবুল ইলম এবং বয়স্ক তালিবুল ইলম এক নয়। বয়স্ক তালিবুল ইলমদের সাথে সাবায়ে কেরামদের সাথে বিশেষ মিল রয়েছে। ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে অধিকাংশ সাহাবী ছিলেন বয়সে বড়। যেমন: যেমন হযরত সিদ্দীকে আকবর ছিলেন রাসূলে আরাবীর পর উম্মতের সবচেয়ে বড় আলেম। ইলমের ময়দানে তাঁর বিচরণ শুরু হয় প্রায় ৪০ বছর বয়সে। হযরত উমর ফারুক (রঃ) ও ৩০ বছর বয়সে ইলমের ময়দানে পা রাখেন। এছাড়া আবু যর (রঃ), আবুদ দারদা (রঃ) প্রমুখ উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন,

وَقَدْ تَعَلَّمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ فِي كِبَرِ سِنِّهِمْ

বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা করো। কারণ অধিকাংশ সাহাবী তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দীনি ইলম শিক্ষা করেছেন। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৩৯)। তবে বয়স্কদের

ক্ষেত্রে ইলম অর্জনের পথে কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। যিনি সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারে, তিনি সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়।

বয়সের সাথে সাথে সাধারণত স্মৃতিশক্তি দূর্বল হতে শুরু করে। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে। আবার মুখস্থ হলেও দীর্ঘদিন মনে রাখা যায় না। এতে করে তালিবুল ইলমের মাঝে হাতাশা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে কঠিন মনে হলেও বারবার চেষ্টা করে যেতে হবে। বারবার চেষ্টার ফলে এক সময় কঠিন বিষয়টি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ইচ্ছায় সহজ হয়ে আসবে। আর যদি বারবার চেষ্টার পরও বুঝে না আসে বা মুখস্থ না হয় তবুও ইলমের জন্য এই চেষ্টা ও কষ্টের কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সওয়াব দান করবেন।

অনেকে ইলম অর্জনের নিয়তে ভর্তি হলেও সামান্য হতাশার কারণে অলসতা পেয়ে বসে। অলসতা থেকে শুরু হয় নিয়মিত পড়ার সাথে ফাঁকি দেওয়া। এই অলসতা, উদ্যমহীনতা ও উদাসীনতা মানুষকে, দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য থেকে পিছিয়ে দেয়। তাই সর্বপ্রথম নিজেকে দ্রুত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। শাইখুল ইসলাম মুফতী তাকি উসমানী দা. বা. বলেন

سستی کاعلاج چستی

অলসতার চিকিৎসা হিম্মত। অলসতা পেয়ে বসলে হিম্মতের সাথে নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে হবে। এভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে যে, অলসতা, উদ্যমহীনতা ও উদাসীনতা আসে শয়তান থেকে। যা শয়তানের সৃষ্ট এবং এগুলো ব্যর্থ মানুষের স্বভাব। তাহলে আমি কেন শয়তানের শিকারে পরিণত হয়ে ব্যর্থ মানুষের কাতারে শামিল হবো। অতঃপর আউযুবিল্লাহ, ইস্তিগফার ও অলসতা থেকে আশ্রয় চেয়ে হাদীসে বর্ণিত দোয়া পড়ে পুনরায় ইলম শেখায় মনোযোগী হতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ

হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অপারগতা ও অলসতা থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের ভার ও মানুষদের দমন-পীড়ন থেকে। (সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস ১৫৫৫)

ফজরের পর না ঘুমানো। তালিবুল ইলম তো বটেই বরং প্রত্যেক সাধারণ মানুষেরও ফজরের পর ঘুম বর্জন করা উচিত। ফজরের পর ঘুমন্ত ব্যক্তি সেই সময়ের বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। আবার ফজরের পরের ঘুম অলসতা ও উদ্যমহীনতার অন্যতম কারণ। করণীয় হলো নামায আদায় করে তেলাওয়াত যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল শুরু করা এতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার অনুগ্রহে ঘুম, অলসতা থেকে বেঁচে থাকতে পারবে। এমনটি হলে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দোয়ার মাঝে শামিল হয়ে যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا

হে আল্লাহ, আমার উম্মতের জন্য দিনের শুরু বরকতময় করুন। (তিরমিযী, হাদিস ১২১২)

বর্তমানে সোস্যাল মিডিয়ার অপব্যবহারের কারণে তালিবুল ইলম নিজের ইলম, আমল ও সময়ের বরকত পান না। তখন বাসা-অফিস-মাদ্রাসার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে হিমশিম খায়। এরপর চাপ সামলাতে না পেরে ইলম শেখার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। এক্ষেত্রে এসবের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত রাখতে হবে। ব্যবহার না করলে আরও ভালো। এগুলোর ব্যবহার যেন তালিবুল ইলমের রাতের ঘুম কেড়ে না নেয় সে দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। তাহলে মন-মস্তিষ্ক শান্ত থাকবে। আর মন মস্তিষ্ক শান্ত থাকলে ইলম ও আমলে সহজে মন বসবে।

তালিবুল ইলম তার রুটিন মাফিক চলার চেষ্টা করবেন। এতে অনর্থক কাজ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে। হাসান বসরী (রহঃ) বলেন,

مِنْ عَلاَمَةِ إِعْرَاضِ اللهِ عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ شُغْلَهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ

কোনো বান্দা থেকে আল্লাহর মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার নিদর্শন হল, অনর্থক কাজ-কর্মে তাকে ব্যস্ত করে দেওয়া। (জামেউল উলূম ওয়াল হিকাম: ১/২৯৪)

বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ওনারা মাদরাসায় আসার পর দেখতে পান উস্তাদরা বয়সে তালিবুল ইলমের চেয়ে ছোট। তখন ছোট বয়সী উস্তাদের সাথে আচরণে আদবহীনতা ও মনে মনে আস্থাহীনতা তৈরি হয়। এটি তালিবুল ইলমের জন্য ইলম থেকে মাহরুমীর একটি বড় কারণ। তাই তালিবুল ইলমের মনে রাখতে হবে যিনি পড়ান, তিনিই তার

উস্তাদ। উস্তাদের প্রতি আস্থা ও আদবের যেন কমতি না থাকে। তাঁকে ডাকার সময়, তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়, তাঁর সামনে বসার সময়, তাঁর নাম নেয়ার সময় যেন আদব থাকে। কেননা এটাই হচ্ছে তালিবুল ইলমের কল্যাণ, সফলতা এবং ইলম হাসিলের চাবিকাঠি। উস্তাদকে তাঁর নাম ধরে ধরে ডাকা যাবে না। অমুক সাহেব। এভাবে ডাকেন তো অফিসের বড় কর্মকর্তা তার চেয়ে ছোট কোনো কর্মকর্তাকে! বরং এভাবে বলবে, উস্তাদজী, হযরত, হযরতজী।

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চাচা আব্বাস (রঃ) কে জিজ্ঞেস করেছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আপনার মধ্যে কে বড়? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন,

هُوَ أَكْبَرُ وَأَنَا وُلِدْتُ قَبْلَه

বড় তো তিনিই, তবে আমি তাঁর আগে জন্মগ্রহণ করেছি। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ২/৭৮)। অন্যদিকে, বয়স্ক তালিবুল ইলম সাধারণত বয়সে বড় হওয়ার কারণে ভাবেন আমি ওনার চেয়ে বয়সে বড় এবং আমি অনেক কিছু জানি ফলে কোন আলেম কি বলেছেন, আলেমদের নানা মতভেদের পিছনে পড়ে, এগুলো নিয়ে অন্যদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। জাফর সাদিক (রহঃ) বলেন,

إياكم والخصومة، فإنها تشغل القلب، وتورث النفاق، وتكسب الضغائن

ধর্মীয় বিষয়ে তর্কবিতর্ক থেকে বেঁচে থাকো। কেননা তা অন্তরকে ব্যতিব্যস্ত রাখে, মুনাফেকির দিকে টেনে নিয়ে যায় এবং বিদ্বেষ তৈরি করে। (মীযানুল হিকমাহ, ১/৭৪৪)

তালিবুল ইলম মাদ্রাসায় পড়ে কিছু মাসআলা শিখে। এতে করে অনেকেই ওনাদের মাসআলা জিজ্ঞেস করে আর ওনারাও অল্প কিছু মাসআলা জানার উপর ভিত্তি করে মাসআলা দিতে করে শুরু করে যা অনেক বড় ভুল। যথাযথ যোগ্যতা ছাড়া মাসআলা দেওয়া বড় ধরনের গোনাহ। ভাসাভাসা, অস্পষ্ট ও দুর্বল জ্ঞান দ্বারা ফতোয়া প্রদান করা বৈধ নয়। এ জন্য সালাফগণ ফতোয়া প্রদানের ব্যাপারে খুবই ভীত থাকতেন এবং যথাসম্ভব এ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতেন। *একবার ইমাম মালিক (রহঃ) কে একটি মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, লা আদরী। তখন তাঁকে বলা হলো, এটাতো খুবই হালকা ও সহজ একটি মাসআলা। কথাটি শুনে তিনি খুবই রেগে উঠলেন। বললেন, "ইলমের কোনো জিনিসই হালকা নয়। তুমি কি এই আয়াত শুননি?*

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا
শীঘ্র আমি তোমার উপর অত্যন্ত ভারী বাণী নাযিল করবো।" (তারতীবুল মাদারিক, ১/৭২)

বয়স্ক তালিবু ইলমরা সেভাবে নিজেদের ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেছে তেমনিভাবে নিজেদের দাওয়াতের মাধ্যমে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও ইলমের প্রতি আগ্রহী করেতে তুলতে হবে। পরিবারের সবাইকে প্রয়োজনীয় দ্বীন শিক্ষা দিতে হবে। তাদের অন্তরে ঈমান ও তাকওয়ার বীজ বপন করতে হবে। এটা কেবল সম্ভব দ্বীনি শিক্ষার মাধ্যমে, পরিবারে নিয়মিত দ্বীনি আলোচনার মাধ্যমে। তা না হলে দ্বীনি শিক্ষার অভাবে ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে দূরে সরে যেতে পারে। তাই তালিবুল ইলমের মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার আগে পরিবারের যে দ্বীনি অবস্থা ছিলো ভর্তি হওয়ার পরও সেই অবস্থার যেন ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে। "বাতির নিচে অন্ধকার" এ প্রবচনটির মত যেন অবস্থা না হয়। তালিবুল ইলমের মতো তার পরিবারও যেন তালিবুল ইলমের ইলম দ্বারা উপকৃত হয়। এক্ষেত্রে লজ্জা-শরম বাধা হওয়া মোটেই উচিত নয়। শিক্ষার ব্যাপারে লজ্জার কিছু নেই। তাই প্রতিদিন সুবিধামত সময়ে দ্বীনি কোনো কিতাব থেকে তালীম করতে হবে, যেখানে পরিবারের সকল সদস্য উপস্থিত থাকবেন। একজন পাঠ করবেন, বাকিরা শুনবেন। এটা ঘরের মধ্যে, পরিবারের লোকদের মাঝে দ্বীনি আবহ বিস্তারে সহায়ক হবে।

তালিবুল ইলমকে ইলম অর্জনের সাথে নিজের তাসাউফ ও ইসলাহকে অনেক গুরুত্ব দিতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন হয় একজন আল্লাহওয়ালার সোহবত ও তাঁর দিকনির্দেশনা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّىٰهَا, وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا
সেই সফলকাম হয়েছে যে নিজ আত্মাকে পবিত্র করেছে, সেই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজ আত্মাকে কলুষিত করেছে। (সূরাঃ ৯১/ আশ-শামস, আয়াত ৯-১০)। নিয়মতান্ত্রিকভাবে একজন আল্লাহওয়ালার অধীনে থেকে নিজের ইসলাহের চেষ্টা করা অতীব জরুরি বিষয়। সুতরাং একজন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক করে তাঁর হাতে বাইয়াত হয়ে যাবে। তখন ইসলাহ সহজ হয়ে যাবে। গোনাহ ত্যাগ করা ও ইবাদতে মনোযোগী হওয়া সহজ হবে। হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) বলেন, *সহজ কথায়*

তাসাউফের সার এই যে, যে ইবাদতে অলসতা আসে, অলসতাকে জয় করে ওই ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়া। যে গোনাহ কমনীয় মনে হয়, ওই গোনাহ ত্যাগ করে ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়া।

পাশাপাশি আল্লাহওয়ালাদের জীবনী ও মুখনিঃসৃত বাণী, উপদেশ, প্রশ্নোত্তর বা কথোপকথনের লিখিত সংকলন নিয়মিত পড়া উচিত। এর দ্বারা নিজেকে উজ্জীবিত রাখা যায়।

তালিবুল ইলমকে দুআর সাথে লেগে থাকতে হবে অথচ এই দুআর ব্যাপারে অনেক উদসীনতা দেখা যায়। ইলম শেখার পাশাপাশি ইলম অন্তরে ধারণের দুআও চলমান রাখতে হবে। ইলম অনুযায়ী আমলের তাওফীকের জন্য দুআ করতে হবে। বর্তমানে ফেতনার যামানা চলছে, তাই আল্লাহর কাছে ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য বেশি থেকে বেশি দুআ করতে হবে। তাই তালিবুল ইলমকে মেহনত ও আদব রক্ষার পাশাপাশি দুআরও অভ্যাস করতে হবে। চেষ্টা ও দুআ, এই দুইয়ের সমন্বয় হলে তবেই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হবে ইন শা আল্লাহ।

ইলম সম্পর্কে কিছু নাসিয়াহ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ) এর আপন ছাত্র ও শিষ্যদের প্রতি একটি উপদেশ, “তোমরা ইলমের ঝর্নাধারা হও এবং হিদায়াতের প্রদীপ হও।”

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রঃ) তাঁর শিষ্য ও পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "হে বৎস, তিন উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করো না। রিয়ার উদ্দেশ্যে, তর্ক করার উদ্দেশ্যে এবং গর্ব করার উদ্দেশ্যে। আর তিন কারণে ইলম ছেড়ে দিও না। মূর্খতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে, ইলমের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে এবং শেখার বিষয়ে লজ্জার কারণে।''

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রঃ) এর একটি দীর্ঘ নসীহতের অংশ, "হে আল্লাহর বান্দাগণ, তাদের কথা চিন্তা করো যারা তোমাদের পূর্বে ছিলো। কোথায় ছিলো তারা গতকাল, আর কোথায় তারা আজ?''

তাঁর এ ওয়াজ ও উপদেশ ছিলো মসজিদে নববীতে মিম্বরে রাসূল থেকে আপন পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রঃ) কে হযরত ওমর (রঃ) এর উপদেশ, "হে বৎস, ঈমানের দাবীগুলো পূর্ণ করো, অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে রোযা রাখো, তলোয়ার হাতে দুশমনের মোকাবেলা করো, আর গোনাহের বিষয়ে সংযম অবলম্বন কর।''

হযরত ওসমান (রঃ) এর উপদেশ, "তোমরা সৎ কাজের আদেশ করো এবং মন্দ কাজে নিষেধ করো, নচেৎ তোমাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে তোমাদের দুষ্টদের, আর তোমাদের উৎকৃষ্টরা তোমাদের জন্য দুআ করবে, কিন্তু তাদের দুআ কবুল করা হবে না।''

হযরত আলী (রঃ) এর উপদেশ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার ফায়সালায় খুশী হবে, তা তো তার উপর কার্যকর হবে, সেই সঙ্গে সে তার আজর পাবে। আর যে আল্লাহর ফায়সালায় রাজী থাকবে না তাও তার উপর কার্যকর হবে, তবে তার আমল বরবাদ হয়ে যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ): এর শিষ্য হযরত আলকামা (রঃ) তাঁর ছাত্রদের বলতেন, "তোমরা নিজেদের মধ্যে ইলমের চর্চা করো। তাহলেই ইলম জীবন্ত থাকবে।''

বলাবাহুল্য যে, সাহাবা কেরামের প্রতিটি উপদেশই ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান। প্রতিটি উপদেশ যেন একটি করে আলো ও নূরের টুকরো।

উপকারী ইলমের দুআ

১.

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

উচ্চারণ: রব্বি যিদনী 'ইলমা।
অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। (সূরাঃ ২০/ ত্বা-হা, আয়াতঃ ১১৪)

২.

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي

উচ্চারণ: রব্বিশরাহ্ লী সদরী, ওয়া ইয়াসসির লী আমরী, ওয়াহলুল ‘উকদাতাম মিন লিসানী, ইয়াফকাহূ কাওলী।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরাঃ ২০/ ত্বা-হা, আয়াতঃ ২৫-২৮)

৩.

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ

উচ্চারণ: রব্বি ইয়াসসির ওয়া লা তু‘আসসির, ওয়া তাম্মিম বিল খাইর।

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি সহজ করে দাও, কঠিন করো না এবং কল্যাণের সাথে সমাপ্ত করে দাও। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, হাদিস ৭০০৩)

৪.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আ‘ইন্নী ‘আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ‘ইবাদাতিক।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর যেন আমি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৫২২; সুনানে নাসাঈ, হাদিস ১৩০৩)

৫.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ‘ইলমান নাফি‘আ, ওয়া রিযকান তায়্যিবা, ওয়া ‘আমালান মুতাকাব্বালা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিজিক এবং কবুলযোগ্য আমল প্রার্থনা করছি। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস ৯২৫)

৬.

اللَّهُمَّ فَقِّهْنَا فِي الدِّينِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ফাক্কিহনা ফিদ্দীন।

অর্থ:হে আল্লাহ! আমাদেরকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করুন। (সহীহ বুখারী, হাদিস ১৪৩)

৭.

اللَّهُمَّ أَيِّدْنِي بِرُوحِ الْقُدُسِ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা আইয়িদনি বেরুহিল কুদুস।

অর্থ: হে আল্লাহ! তুমি আমাকে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করো। (বুখারি ৪৫৩; মুসলিম ২৪৮৫; মেশকাত ৪৭৮৯)

৮.

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

উচ্চারণ: সুবহানাকা লা ‘ইলমা লানা ইল্লা মা ‘আল্লামতানা, ইন্নাকা আন্তাল ‘আলীমুল হাকীম।

অর্থ: আপনি পবিত্র! আপনি আমাদের যা শিক্ষা দিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (সূরাঃ ২/ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৩২)

৯.

اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِّي

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মাজ‘আলিল কুরআনা রবী‘আ কালবী, ওয়া নূরা সদরী, ওয়া জালাআ হুজনী, ওয়া যাহাবা হাম্মী।

অর্থ: হে আল্লাহ! কুরআনকে আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, বক্ষের আলো, দুঃখের অপসারণকারী এবং দুশ্চিন্তা দূরকারী বানিয়ে দিন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস ৩৭১২)

১০.

اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা লা সাহলা ইল্লা মা জা‘আলতাহু সাহলা, ওয়া আন্তা তাজ‘আলুল হাজনা ইযা শি’তা সাহলা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি যা সহজ করেন তা ছাড়া কিছুই সহজ নয়। আর আপনি ইচ্ছা করলে কঠিন বিষয়কেও সহজ করে দেন। (সহিহ ইবনে হিব্বান, হাদিস ৯৭৪)

১১.

اللَّهُمَّ انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعُنِي وَزِدْنِي عِلْمًا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মানফা'নী বিমা 'আল্লামতানী, ওয়া 'আল্লিমনী মা ইয়ানফা'উনী, ওয়া যিদনী 'ইলমা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আপনি আমাকে যা শিখিয়েছেন তা দ্বারা উপকৃত করুন, আমাকে উপকারী জ্ঞান শিক্ষা দিন এবং আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। (তিরমিযী, হাদিস ৩৫৯৯)

১২.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযু বিকা মিন 'ইলমিল লা ইয়ানফা', ওয়া মিন কালবিল লা ইয়াখশা', ওয়া মিন নাফসিল লা তাশবা', ওয়া মিন দা'ওয়াতিল লা ইউস্তাজাবু লাহা।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই এমন জ্ঞান থেকে যা উপকারে আসে না, এমন হৃদয় থেকে যা আল্লাহভীরু নয়, এমন নফস থেকে যা তৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ থেকে যা কবুল করা হয় না। (সুনানে নাসাঈ, হাদিস ৫৪৪২)

১৩.

اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মার হামনী বিল কুরআন, ওয়াজ'আলহু লী ইমামাও ওয়া নূরাও ওয়া হুদাও ওয়া রাহমাহ।

অর্থ: হে আল্লাহ! কুরআনের মাধ্যমে আমার প্রতি রহম করুন এবং এটিকে আমার জন্য পথপ্রদর্শক, আলো, হেদায়েত ও রহমত বানিয়ে দিন।

১৪.

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা যাক্কিরনী মিনহু মা নাসীতু, ওয়া ‘আল্লিমনী মিনহু মা জাহিলতু, ওয়ারযুকনী তিলাওয়াতাহু আনা আল-লাইলি ওয়া আতরাফান নাহার, ওয়াজ‘আলহু লী হুজ্জাতান ইয়া রব্বাল ‘আলামীন।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি কুরআনের যা ভুলে গেছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিন, যা জানি না তা আমাকে শিক্ষা দিন, দিন-রাতের বিভিন্ন সময়ে কুরআন তিলাওয়াতের তাওফিক দিন এবং এটিকে আমার পক্ষে দলিল হিসেবে গ্রহণ করুন।

১৫.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘ঊযু বিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাজান, ওয়াল ‘আজযি ওয়াল কাসাল, ওয়াল বুখলি ওয়াল জুবন, ওয়া দালা‘ইদ-দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজাল।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখ থেকে, অক্ষমতা ও আলস্য থেকে, কৃপণতা ও ভীরুতা থেকে, ঋণের বোঝা এবং মানুষের প্রভাব ও পরাভূত হওয়া থেকে। (সহীহ বুখারি, হাদিস ২৮৯৩, ৬৩৬৯)

১৬.
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ
উচ্চারণ: আল্লাহুম্মা ইন্নী আ‘ঊযু বিকা মিনাল ‘আজযি ওয়াল কাসাল।
অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অক্ষমতা ও আলস্য থেকে আশ্রয় চাই। (সহীহ বুখারী, হাদিস ৬৩৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৭০৬)

১৭. আলী (রঃ) থেকে বর্ণিত যে, ফাতিমা (রঃ) আটা পিষার কষ্টের কথা জানান। তখন তাঁর নিকট সংবাদ পৌঁছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে কয়েকজন বন্দী আনা হয়েছে। ফাতিমা (রঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে এসে একজন খাদিম চাইলেন। তিনি তাঁকে পেলেন না, তখন তিনি তা আয়িশা (রঃ) এর কাছে উল্লেখ করেন। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এলে আয়িশা (রঃ) তাঁর কাছে বিষয়টি বললেন। (রাবী বলেন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে এলেন। তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছিলাম। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। আমি তাঁর পায়ের

শীতলতা আমার বুকে অনুভব করলাম। তখন তিনি বললেন, ’তোমরা যা চেয়েছ, আমি কি তোমাদের তার চাইতে উত্তম বস্তুর সন্ধান দিব না? (তিনি বললেন) যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে, তখন চৌত্রিশ বার ’আল্লাহ আকবার’ তেত্রিশবার ’আলহামদুলিল্লাহ’ এবং তেত্রিশবার ’সুবহানাল্লাহ’ বলবে, এই তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ। (সহীহ বুখারী ২৮৯৩)।
হাদীসটি প্রসিদ্ধ, আমরা অনেকেই জানি। এই হাদীসের ওপর আমল করলে কর্মক্ষমতা বাড়ে, অলসতা দূর হয়, একটুতেই ক্লান্ত হওয়ার ভাব চলে যায়। যদি সালাত বা অন্যান্য ইবাদতে আলসেমি লাগে, তখন এই আমল করলে সেটা চলে যায়। এটা ঘুমের আগেও করা যায়, এছাড়া দিনের মধ্যে যে কোনো সময় ক্লান্তি ভর করলে তাৎক্ষণিক উপকারের জন্য তখনই এই আমলটি করা যেতে পারে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছিলেন, “এই তোমাদের জন্য তার চাইতে উত্তম, যা তোমরা চেয়েছ” কথাটির কারণ খুবই পরিষ্কার। এই তাসবিহগুলোতে ক্লান্তি দূর হয়, কাজ সহজেই হয়ে যায়, খাদিমের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বেঁচে যায়। ওপরন্তু ১০০ বার তাসবিহ পড়ার জন্য আখিরাতের হিসাবের খাতায় অনেক সওয়াবও জমে যাচ্ছে। এর চেয়ে উত্তম নসিহত আর কী হতে পারে!

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, ইলম মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি। ইলম মানুষকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে এবং তাকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত রাখে। ইসলাম ইলম অর্জনকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের পথ সুগম হয়েছে। ইলমের যথাযথ চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগ মানুষের চরিত্র গঠন, নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত উপকারী ইলম অর্জন করে তা অন্যদের মাঝে প্রচার করা, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এর যথাযথ চর্চা এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা।

সর্বশেষে, এই গবেষণাপত্রটি সর্বপ্রথম আমার নিজের জন্য নসীয়াহ ও আত্মশুদ্ধির একটি মাধ্যম। এর মাধ্যমে আমি নিজে যেন ইলমের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করে তার দাবি অনুযায়ী আমল করতে পারি এটাই আমার একান্ত কামনা। অতঃপর এটি পাঠকদের জন্যও উপকারী নসীয়াহ, চিন্তার খোরাক এবং কল্যাণের উৎস হয়ে উঠুক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদের সকলকে উপকারী ইলম অর্জন, তার ওপর আন্তরিকতার সঙ্গে আমল এবং তা মানুষের মাঝে প্রচার করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১. কিতাবুল ইলম (জ্ঞান)
মূল: মুহাম্মাদ ইবনে জ্বলিহ আল-উছাইমীন (রহ)
অনুবাদক: আব্দুর রায্যাক বিন আব্দুর রশীদ ও
মোজাফফার বিন মুকসেদ।
২. ঈমান রক্ষা ও আদর্শ সন্তান গঠনে ফরয ইলমের গুরুত্ব ও মাকতাবের ভূমিকা
রচনা: মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব, মাওলানা মিজানুর রহমান।

৩. দরদী মালীর কথা শোনো
লেখক: মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ।
৪. ইলম অর্জনের আদব কোর্সের ক্লাস নোট (ATI, IOM)
৫. লেকচার:

- শায়খ আব্দুল কাইয়ুম (হাফি:)
- মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব (হাফি:)
- প্রফেসর আবু বকর মুহাম্মদ যাকারিয়া (হাফি:)
- মুফতী জসিমউদ্দিন রহমানী (হাফি:)
- মুফতী শহীদুল্লাহ (হাফি:)
- উস্তাদ আব্দুল্লাহ আল মাসউদ (হাফি.)
- উস্তাদ মনজুরুল করিম (হাফি:)

৬. https://quran.com/bn/
৭. https://www.hadithbd.com/
৮. https://muslimbangla.com/
৯. https://www.alkawsar.com/bn/
১০.https://at-tahreek.com/
১১.https://salafiforum.com/?srsltid=AfmBOoqf3pYwNbXn3zQK4BpNDX6iX-fGykSrdSagLwsGMdHxzObBbxLH